সমকাল
প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী আয়োজন ১
বৃহস্পতিবার ২০ অগ্রহায়ণ ১৪৩১ | ৫ ডিসেম্বর ২০২৪

মুক্তপ্রাণ। মুক্তধারা

১০ বছরে সমকাল
মুক্তপ্রাণ। মুক্তধারা

২০তম বর্ষে
পদার্পণ উপলক্ষে
সমকালের পাঠক,
লেখক, সাংবাদিক ও
সংবাদকর্মীদের জানাই

শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন

AERONESS INTERNATIONAL LIMITED
206/A, Colloid Centre (Level-2), Tejgaon Industrial Area, Dhaka-1208, Bangladesh
Tell : +880-2-2222-83762, +880-2-2222-83586, Fax : +880-2-8835028, Email : info@aeroness.com

বুর্জোয়াদের রাজনীতিতে মানুষের আস্থা নেই

সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী

প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী আয়োজন

গত ৫ আগস্ট ঘটেছেটা কী? সেটার বিবেচনা খুবই জরুরি। কেউ বলছেন, আমরা দ্বিতীয়বার স্বাধীন হলাম। কারও কারও ধারণা আরও অগ্রসর। তারা বলছেন, দেশে একটা বিপ্লবই ঘটে গেছে। বাস্তবে কিন্তু দুটির কোনোটাই ঘটেনি। যেটা ঘটেছে তা হলো, একটি সরকারের পতন। এ দেশে মানুষ অনেক রকমের সরকার দেখেছে; ব্রিটিশ সরকার আলাদা, সেটা ছিল বিদেশি, পাকিস্তানি শাসকরাও বিদেশিই ছিল; কিন্তু পতিত সরকারটির মতো স্বদেশি সরকার আগে কেউ কখনও দেখেনি। আমাদের দুর্ভাগ্য কোনো সরকারই জনগণের পক্ষে ছিল না, সকল সরকারই ছিল জনবিরোধী। শাসকেরা নানাভাবে শোষণ করেছে, যেন প্রতিযোগিতায় নেমেছিল। কিন্তু যে সরকারকে জনগণ এবার বিতাড়িত করল, সেই সরকারের মতো নিষ্ঠুর ও বধির সরকার আর দেখা যায়নি। এই সরকার কোনো আইনকানুন মানেনি। সরকার পরিবর্তনটা শান্তিপূর্ণভাবেই ঘটতে পারত, যদি স্বাভাবিক পদ্ধতিতে নির্বাচন হতো। কিন্তু সরকার তাতে সম্মত ছিল না। নির্বাচনের নামে একের পর এক প্রহসন ঘটিয়ে টিকে থাকার আয়োজন করেছে। ফলে পতন শেষ পর্যন্ত ঘটলই, তবে সহিংস উপায়ে। তাতে বহু মানুষ হতাহত হলেন, সম্পদ ও স্থাপনা নষ্ট হলো। পুলিশ আগেই জনবিচ্ছিন্ন ছিল, এবার তাদেরকে যে ভূমিকায় নামানো হলো, তাতে তাদের ভাবমূর্তি দাঁড়াল জনশত্রুর। থানা আক্রান্ত হয়েছে, পুলিশ সদস্যরাও হতাহত হয়েছেন, পুলিশ বাহিনীর পক্ষে জনসমক্ষে হাজির হওয়া হয়ে পড়েছিল রীতিমতো বিপজ্জনক।

আন্দোলনটা শুরু হয়েছিল সাদামাটাভাবেই এবং ন্যায্য একটা দাবি নিয়ে; সেটা হলো সরকারি চাকরিতে কিছু গোষ্ঠীর জন্য বড় একটা ভাগ সংরক্ষিত রাখার বিদ্যমান বন্দোবস্ত পরিবর্তনের। সংরক্ষিত ভাগটা কেবল বড় নয়, ছিল খুব বড়, শতকরা ৫৬। এতে বাদবাকি চাকরিপ্রার্থীরা বঞ্চিত হচ্ছিল। সমস্যাটা ছিল মূলত শিক্ষার্থীদের জন্যই; শিক্ষাজীবন সমাপ্ত করে যারা চাকরির সন্ধানে নামবে বিশেষভাবে তাদের জন্য। শতকরা ৫৬টি চাকরি যদি নির্দিষ্ট কয়েকটি গোষ্ঠীই নিয়ে নেয়, তাহলে অন্যদের জন্য পাওয়ার সুযোগ আর কতটা থাকে?

কেবল নামেই বৈষম্যের বিরুদ্ধে গণঅভ্যুত্থান। শুরু করেছিল পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা, এসে যোগ দিয়েছে প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরাও। এসেছে স্কুল, কলেজের ছেলেমেয়েরাও। সবাই বৈষম্যবিরোধী। কিন্তু কেবল শিক্ষার্থীদের আন্দোলনে সীমিত থাকলে এই গণঅভ্যুত্থান সম্ভব হতো না। সম্ভব হবার কারণ এতে যোগ দিয়েছিলেন সাধারণ মানুষও। উন্নয়নে তারা বঞ্চিত। শুধু বঞ্চিত নন, নির্মমভাবে নিষ্পেষিত।

পিতা চলে গেলেই পিতৃতান্ত্রিকতা যে বিদায় হয় তা নয়। পিতৃতান্ত্রিকতার অবসান ঘটানোর জন্য একটি সামাজিক বিপ্লব আবশ্যক। আমাদের দেশে সে বিপ্লব আজও ঘটেনি। মানুষের সঙ্গে মানুষের অধিকারের সাম্য প্রতিষ্ঠিত হয়নি; ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণও যে সহসা ঘটবে এমন আশা নেই। মানুষের মৌলিক চাহিদাগুলো মেটানোর নিশ্চয়তা প্রাপ্তি দূরের সুখস্বপ্ন বটে। আর সামাজিক বিপ্লবের মধ্য দিয়ে যেহেতু ব্যক্তিমালিকানার জায়গাতে সামাজিক মালিকানার প্রতিষ্ঠা ঘটেনি, তাই বৈষম্য উৎপাদনের প্রকৃত ক্ষেত্রটি অক্ষুণ্নই রয়ে গেছে। আর স্বাধীনতা? সেটা তো আমরা বারবার পাচ্ছি। সাতচল্লিশে পেলাম, পেলাম একাত্তরে, বলা হচ্ছে, এবারও পেয়েছি। কিন্তু প্রকৃত স্বাধীনতা পেয়েছি কি? আবারও স্মরণ করা যাক, প্রকৃত স্বাধীনতার নাম হচ্ছে মুক্তি। মূলত অর্থনৈতিক মুক্তি। সেই মুক্তি আশেপাশে কোথাও নেই। বৈষম্যের রাজত্বই সর্বত্র ব্যাপ্ত। ওই বৈষম্যের রক্ষক হচ্ছে পুঁজিবাদ ও সাম্রাজ্যবাদ। ফ্যাসিবাদ পুঁজিবাদেরই নিকৃষ্টতম রূপ।

উনসত্তরের গণঅভ্যুত্থানের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ আওয়াজটা ছিল স্বাধীন জনগণতান্ত্রিক পূর্ববঙ্গ প্রতিষ্ঠার। মনে হচ্ছিল তার প্রতিষ্ঠা বুঝি ঘটেই যাবে। কারণ অভ্যুত্থানে সমাজতন্ত্রীরাই ছিলেন প্রধান শক্তি। কিন্তু জনগণের রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা তো সম্ভব হয়নি; রাষ্ট্রক্ষমতা চলে গেছে বুর্জোয়াদের হাতেই। এবং এই বুর্জোয়ারা এতই অধঃপতিত যে তাদের দেশপ্রেম ক্রমাগত নিচের দিকে নেমেছে, তরল পানি যেভাবে নামে। বুর্জোয়ারা ভূমি, নদী, বন, ব্যাংক– যা কিছু দেখতে পেয়েছে, সবকিছু লুণ্ঠন করে কিছুটা ব্যক্তিগত ভোগে, বাকিটা বিদেশে পাচারের কাজে লাগিয়েছে। পুঁজিবাদী ধারায় তারা যে উন্নয়ন ঘটিয়েছে, তাতে মেহনতি মানুষ, যাদের শ্রমে উন্নয়ন ঘটেছে তারা কেবল বঞ্চিতই নয়, উন্নয়নের চাপে বিধ্বস্তও বটে। বাংলাদেশে বর্তমান যে সংকট, সেটি বুর্জোয়া রাষ্ট্র ব্যবস্থার এবং তার শাসকগোষ্ঠীর দ্বারা সৃষ্ট। রাষ্ট্রের এই শাসকেরা দেশপ্রেমবিবর্জিত এবং আত্মস্বার্থ পুষ্টির সাধনায় লিপ্ত। সম্রাটদের গায়ে জামাকাপড় নেই। ভুক্তভোগী জনগণ সবই দেখে; কিন্তু কিছু বলতে পারে না; কারণ তাদের নিজস্ব কোনো রাজনৈতিক শক্তি গড়ে ওঠেনি।

বৈষম্য বিরোধিতার আওয়াজটা কিন্তু মোটেই নতুন নয়। এটি বঞ্চিতদের অতিপুরাতন রণধ্বনি; কিন্তু তাকে বারবার তুলতে হয়। কারণ বৈষম্য দূর হয় না, হবেও না যদি ব্যবস্থা না বদলায়। ব্যবস্থা না-বদলালে বৈষম্য বাড়তেই থাকবে, এবং বাড়ছেও। উনসত্তরের ব্যবস্থা-কাঁপানো ঐতিহাসিক অভ্যুত্থানের পরে মওলানা ভাসানী তাঁর সেই অসামান্য তরুণ কণ্ঠে আওয়াজটা নতুন করে তুলেছিলেন; বলেছিলেন, 'কেউ খাবে আর কেউ খাবে না, তা হবে না তা হবে না।' বিশ্বকবিতার এক কবিতার বুঝি প্রথম পঙ্‌ক্তি। ওই উনসত্তরেই ভাসানীপন্থি তরুণ আসাদ যখন পিতৃতান্ত্রিক স্বৈরাচারী আইয়ুব খানের লেলিয়ে দেওয়া পুলিশের গুলিতে শহীদ হন তখন তাঁর সহযোদ্ধারা স্লোগান দিয়েছিলেন, 'আসাদের মর্ম জনগণতন্ত্র'। একই আওয়াজ, ভিন্ন শব্দগুচ্ছে। আসাদের পূর্বসূরি বায়ান্নর শহীদ বরকতও ছিলেন একই রাজনৈতিক ধারার মানুষ। সে-ধারাও বৈষম্য বিরোধিতারই, রাষ্ট্রভাষার প্রশ্নে। এবারের অভ্যুত্থান কেবল ব্যক্তিগত সরকারি চাকরির নিশ্চয়তার দাবিতে কোটাবৈষম্য নিরসনের ছিল না।

বিদ্যমান সমাজ বাস্তবতাটা মোটেই সুখপ্রদ নয়। বিশ্বব্যাপীই এখন মানুষের দারুণ দুর্দশা চলছে। তা থেকে মুক্তির উপায় ব্যক্তিমালিকানাধীন ও মুনাফাভিত্তিক পুঁজিবাদী ব্যবস্থাকে বিদায় করে সামাজিক মালিকানার নতুন বিশ্ব গড়ে তোলা। সে জন্য কেবল রাষ্ট্রীয় সংস্কার নয়, সামাজিক বিপ্লবও প্রয়োজন হবে। রাজা ও প্রজার সম্পর্ক ছিন্ন করে, বৈষম্য ঘুচিয়ে ফেলে প্রতিষ্ঠিত করা চাই প্রকৃত সাম্য ও মৈত্রীর সম্পর্ক। তার জন্য সামাজিক বিপ্লব ভিন্ন অন্য কোনো পথ নেই। সংস্কারে কুলাবে না। লুণ্ঠন এবং ত্রাণ তৎপরতা দুটোই সত্য; প্রথমটি ঘটে ব্যক্তিগত মুনাফার লোভে; দ্বিতীয়টি প্রকাশ পায় সমষ্টিগত মঙ্গলের আকাঙ্ক্ষায়।

এরপর ৬ পৃষ্ঠায়

সাক্ষাৎকার

রাষ্ট্রবিজ্ঞানী ও সেন্টার ফর পলিসি ডায়ালগের (সিপিডি) সম্মাননীয় ফেলো **ড. রওনক জাহান** সমকাল-এর সঙ্গে কথা বলেছেন জুলাই গণঅভ্যুত্থানের প্রেক্ষাপট ও গণঅভ্যুত্থান-পরবর্তী রাজনৈতিক বাস্তবতা নিয়ে। সেখানে উঠে এসেছে রাজনীতিতে বিভাজন, নির্বাচন ও রাষ্ট্রীয় সংস্কারের বিভিন্ন দিক। সাক্ষাৎকার নিয়েছেন **মাহবুব আজীজ**

‘গণতন্ত্রের পথে যাত্রা কখনোই মসৃণ হয় না’

রওনক জাহান

৫ আগস্ট ছাত্র-জনতার অভ্যুত্থানে শেখ হাসিনা সরকারের পতন হয়। একজন সমাজবিজ্ঞানী হিসেবে গণতন্ত্রের পথে এই যাত্রাকে কীভাবে ব্যাখ্যা করবেন?

গণঅভ্যুত্থানের মধ্য দিয়ে স্বৈরাচারী শাসনের পতন হওয়ার পর জনমানসের মধ্যে অনেক আকাঙ্ক্ষা জন্ম নেয়। কিন্তু গণতন্ত্রের পথে যাত্রা কখনোই মসৃণ হয় না। কারণ, পুরোনো অনেক অগণতান্ত্রিক চর্চা রয়ে যায়। যারাই ক্ষমতায় যান, তাদের পক্ষে পুরোনো পথে হাঁটা সহজ। নতুন পথে হাঁটতে গেলে অনেক ধৈর্য ও বিচক্ষণতার প্রয়োজন। বৃহৎ সব রাজনৈতিক শক্তির মধ্যে গণতান্ত্রিক চর্চার ব্যাপারে ঐকমত্যের প্রয়োজন। অনেক সময় সেই নতুন পথে হাঁটতে গেলেও যে সাফল্য আসবে, তাও নয়। মাঝে মাঝেই হোঁচট খেতে হবে। এজন্য অনেক সময় মানুষ পুরোনো পথেই হাঁটে।

আমরা এর আগে ১৯৯০ সালে একবার সামরিক শাসনের পতন ঘটিয়েছিলাম এক গণঅভ্যুত্থানের মধ্য দিয়ে। তারপর আমাদের যে নতুন যাত্রা শুরু হয়, সেই যাত্রা প্রথমদিকে কিছুটা হলেও সামনে এগিয়েছিল। চারটা জাতীয় নির্বাচন হয়েছিল নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে; যার মধ্য দিয়ে ক্ষমতার পালা-বদল হয়েছিল আওয়ামী লীগ ও বিএনপির মধ্যে। কিন্তু ২০০৬-০৭ সালে তত্ত্বাবধায়ক সরকারই অকার্যকর হয়ে গেল! আমরা দুই বছরের মতো সেনা-সমর্থিত তত্ত্বাবধায়ক সরকার দ্বারা শাসিত হলাম। এরপর ২০০৯ সালে মনে হয়েছিল, আমরা গণতন্ত্রের পথে আবার নতুনভাবে যাত্রা আরম্ভ করতে পারব; যে দুই দলের মধ্যে পালা-বদল হয়েছে, তারা একে-অপরের প্রতি আরেকটু সহনশীল হবেন। আমরা দেখলাম, তা আর হলো না।

ক্ষমতায় এসে আওয়ামী লীগ সম্পূর্ণ অগণতান্ত্রিকভাবে পরপর তিনটি একপক্ষীয় নির্বাচন করেছে। এরপর আমরা আবার গণঅভ্যুত্থানের মধ্য দিয়ে ২০২৪ সালে আরেকবার গণতন্ত্রের পথে হাঁটার সুযোগ পেয়েছি।

প্রতিবারই আমরা রাজনীতিতে গণতান্ত্রিক চর্চার সংকটে পড়ছি। রাজনৈতিক দল ও রাজনীতিবিদরা, যারা গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করার ক্ষেত্রে সবচেয়ে বেশি ভূমিকা রাখেন; তারা যদি গণতন্ত্রের প্রতি দায়বদ্ধ না হন, তাহলে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করা প্রায় অসম্ভব। এখন আমাদের প্রধান চ্যালেঞ্জ হলো– আমরা কীভাবে রাজনৈতিক দল ও রাজনীতিবিদদের গণতান্ত্রিক আচরণ, গণতান্ত্রিক চর্চার প্রতি সত্যিকারভাবে দায়বদ্ধ রাখতে পারব। নির্বাচনের আগে ও পরে সরকারি ও বিরোধী দলগুলোকে যদি আমরা সার্বক্ষণিক দায়বদ্ধতার মধ্যে না আনতে পারি, তাহলে আমরা আবার পথভ্রষ্ট হতে পারি। এর জন্য দরকার মিডিয়া ও নাগরিক সমাজের মতপ্রকাশের স্বাধীনতা।

● এর আগে যতবার সরকারবিরোধী আন্দোলন হয়েছে, বা গণঅভ্যুত্থান হয়েছে, তাতে নেতৃত্ব দিয়েছে রাজনৈতিক দলগুলো। এবার নেতৃত্বে কোনো রাজনৈতিক দল ছিল না। এ আন্দোলনের ভিন্নতা কোথায়?

●● এর আগে অনেক রাজনৈতিক আন্দোলন হয়েছে; মাঝে মাঝে সরকারবিরোধী আন্দোলনও হয়েছে। সেগুলো বেশির ভাগ ক্ষেত্রে ছাত্র-জনতা মিলেই করেছে। ছাত্ররা নেতৃত্বের ভূমিকায়ও ছিল। আমরা যদি ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলনের দিকে তাকাই, দেখা যাবে– সেটি ছাত্ররাই করেছে। পরে দেশের জনসাধারণ এতে সমর্থন দিয়েছিল। ১৯৫৪ সালে যে মুসলিম লীগ সরকারের পতন হলো, সেটি ভাষা আন্দোলনের প্রভাবেই হয়েছে। এরপর আমরা যদি ১৯৬৯ সালের আইয়ুববিরোধী আন্দোলন দেখি, সেখানেও ছাত্ররা নেতৃত্ব দিয়েছে। ছাত্রদের সঙ্গে শ্রমিক শ্রেণিও ওই আন্দোলনে অংশগ্রহণ করে। বাংলাদেশ হওয়ার পর ১৯৯০-এর গণঅভ্যুত্থানেও ছাত্রদের অগ্রণী ভূমিকা ছিল। অবশ্যই ওই আন্দোলনে দেশের সব রাজনৈতিক দলের ঐক্যবদ্ধ অংশগ্রহণ সরকার পতনে কেন্দ্রীয় ভূমিকা রেখেছে।

যে কোনো সফল আন্দোলনের একটা পটভূমি থাকে। দেখা যাবে, সফল হওয়ার আগে একই বিষয়ে দুই-তিনটা আন্দোলন হয়েছে, সেগুলো হয়তো সরকার দমন করে দিতে পেরেছে। এরপর একটা আন্দোলন হয়তো সফল হয়। কারণ, ততদিনে হয়তো বা জনসাধারণের মধ্যে অনেক সমর্থন আদায় করা সম্ভব হয়। এরশাদবিরোধী আন্দোলনের ক্ষেত্রে আমরা দেখেছি, এরশাদ ক্ষমতায় আসার পরপরই ছাত্ররা বেশ কয়েকবার আন্দোলন করেছে; কিন্তু সেগুলো দমন করা সম্ভব হয়। এরপর বড় দুই দলসহ সব দলই এরশাদের বিরুদ্ধে আন্দোলন শুরু করে। শেষ পর্যন্ত ১৯৯০ সালে আন্দোলন সফল হয়।

এরপর ৬ পৃষ্ঠায়

চব্বিশের গণঅভ্যুত্থান

প্রেক্ষাপট, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ

মাহবুব উল্লাহ

প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী আয়োজন

দেশ হিসেবে বাংলাদেশ অনন্য। বিশ্বের অনেক দেশের সঙ্গেই এ দেশের তুলনা চলে না। ছাপ্পান্ন হাজার বর্গমাইলের এ ভূখণ্ডে আঠার কোটি লোক বাস করে। কেউ কেউ মনে করেন, বাংলাদেশের লোকসংখ্যা আঠার কোটিরও বেশি হবে। স্বাভাবিকভাবে এটি এমন একটি দেশ, যেখানে খুব অল্প ভূখণ্ডের ওপর দাঁড়িয়ে বিপুল সংখ্যক মানুষ তাদের জীবন-জীবিকা নির্বাহ করে। অর্থনীতিতে মাথাপিছু আয়ের একটা ধারণা চালু আছে। অর্থনীতিবিদদের খুব পছন্দের একটি সূচক এটি। আমরা যদি একটু ভিন্নভাবে দেখি, সেটি হচ্ছে, প্রতি এক বর্গমাইলে কোনো দেশে কত আয় হয়। আগের সূচক ছিল প্রত্যেক ব্যক্তিকে কেন্দ্র করে। এখন হিসাব হচ্ছে ভূখণ্ডকে কেন্দ্র করে। ভূখণ্ডকেন্দ্রিক হিসাব যদি আমরা দেখি, তাহলে বুঝব, বাংলাদেশে প্রতি বর্গমাইলে যে পরিমাণ উৎপাদন হয়, যে পরিমাণ সম্পদ সৃষ্টি হয়, সেটি অনেক দেশের তুলনায় বেশি। তা যদি না হতো তাহলে এ দেশের মানুষের পক্ষে জীবনরক্ষা করা কঠিন হতো। বাংলাদেশ সম্পর্কে নৃবিজ্ঞানীরা বলেছেন বা বলেন যে, এইখানে সম্পদের জন্য তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতা হয়।

এরিক ইয়েনসন নামে একজন নৃ-তত্ত্ববিদ আছেন। তিনি একটি বই লিখেছিলেন, রুরাল বাংলাদেশ: কম্পিটিশন ফর স্কেয়ার্স রিসোর্সেস। গ্রাম বাংলায় তিনি অবস্থান করেছেন এবং সেখান থেকেই তিনি অভিজ্ঞতা নিয়েছেন। এ বইয়ে তিনি দেখিয়েছেন, সম্পদের জন্য, বিশেষ করে জমির জন্য তীব্র প্রতিযোগিতা হয় গ্রামবাসীর মধ্যে। গ্রামে একজন মানুষ অপরজনকে 'ভাই' বলে সম্বোধনও করে। ক্ষেত্রবিশেষে আমরা জানি চাচা, জেঠু– এ জাতীয় সম্বোধন করা হয়। এরিক ইয়েনসন তাঁর গবেষণায় গ্রামের নাম দিয়েছিলেন 'ভাইমারা'। নৃ-তত্ত্ববিদরা কোনো স্থান বা ব্যক্তির পরিচিতি প্রকাশ করে না। তারা সেখানে ছদ্মনাম ব্যবহার করে। তাঁর 'ভাইমারা' গ্রামটি ঢাকার অদূরে মানিকগঞ্জে অবস্থিত। সেখানে সম্পদের জন্য, বিশেষ করে জমির জন্য তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতা এবং এর ফলাফল হিসেবে মাঝে মাঝে রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষ দেখতে পাওয়া যায়। যে কারণে গ্রামটির ছদ্মনাম 'ভাইমারা', অর্থাৎ এখানে ভাই ভাইকে মারে। এটিকে যদি আমরা বাংলাদেশের একটি বৈশিষ্ট্য হিসেবে দেখি, তাহলে প্রশ্ন জাগে, বাংলাদেশের রাজনীতিতে এর বাস্তব প্রতিফলন কীভাবে ঘটে।

বাংলাদেশ হচ্ছে এমন একটি দেশ, যেখানে মোটামুটি বলা যায়, দশ বছরের চক্রে একটি বিশাল অভ্যুত্থান হয়। বিশালভাবে এ দেশের মানুষ জেগে ওঠে। আমরা ব্রিটিশ শাসন থেকে মুক্ত হওয়ার পরবর্তী সময় থেকে যদি বিচার করি, দেখব এখানে বায়ান্নতে ভাষার দাবিতে একটি অভ্যুত্থান হয়েছে। আরও দশ বছর পরে বাষট্টিতে শিক্ষার প্রশ্নে আন্দোলন হয়েছে। বাষট্টির আরও সাত বা আট বছর পর উনসত্তরে এসে হয়েছে আরেকটি বিশাল অভ্যুত্থান। এত বড় অভ্যুত্থান এর আগে কখনও হয়নি। উনসত্তরের পর সমগ্র পাকিস্তানে প্রথমবারের মতো সাধারণ নির্বাচন হলো, সত্তরে। সেই নির্বাচনে আওয়ামী লীগ ব্যাপকভাবে জয়যুক্ত হলো এবং সংসদে সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করল সমগ্র পাকিস্তানে। এটিই পাকিস্তানি শাসকদের মাথাব্যথার কারণ হয়ে দাঁড়াল। বিশেষ করে পাকিস্তানের ডিপ স্টেটের সঙ্গে জড়িত গোষ্ঠী কিছুতেই ভাবতে পারল না যে, বাঙালিরা পাকিস্তানকে শাসন করবে। এ কারণে তারা ক্ষমতা হস্তান্তরে টালবাহানা করে। নানারকম প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে। শেষ পর্যন্ত মানুষের এই বিশাল আকাঙ্ক্ষাকে দমন করার জন্য– একদিকে গণতন্ত্রের আকাঙ্ক্ষা, আরেকদিকে স্বাধিকারের আকাঙ্ক্ষা– ২৫ মার্চ ১৯৭১ রাতে এখানে তারা সামরিক অভিযান শুরু করল। এটিকে বলা হয় 'ক্র্যাকডাউন'। এ ক্র্যাকডাউনের ফলে শত-সহস্র মানুষের মৃত্যু ঘটল। একদিকে যেমন মানুষের মৃত্যু, আরেকদিকে তেমনই এটিও নির্ধারিত হয়ে গেল যে, পাকিস্তানেরও মৃত্যু হয়েছে।

বাংলাদেশ হওয়ার পর আমরা দেখলাম এখানেও অভ্যুত্থান, রক্তপাত হচ্ছে এবং মোটামুটি কয়েক বছর পরপরই তা হচ্ছে। ১৯৭৫ সালে শেখ মুজিবুর রহমান ও তাঁর পরিবারের সদস্যদের হত্যা করা হয়। দেশের শাসনক্ষমতা সামরিক বাহিনীর হাতে চলে যায়। সেটি একটা বড় রকমের পরিবর্তন। আবারও রক্তপাত হলো ১৯৮১ সালে। রাষ্ট্রপ্রধান জিয়াউর রহমানকে সামরিক বাহিনীর কর্মকর্তারাই হত্যা করেছে। এরপর সেভাবে বড় কোনো রক্তপাতের ঘটনা ঘটেনি, কিন্তু আন্দোলন-অভ্যুত্থান ঘটেছে। বাংলাদেশ-উত্তরকালে প্রথম গণঅভ্যুত্থান হয় নব্বইয়ের দশকে। এই অভ্যুত্থানের ফলে স্বৈরাচারী শাসক এরশাদ ক্ষমতা থেকে বিদায় নিতে বাধ্য হন। এ ছাড়া নব্বইয়ের পরে বেশ কিছু আন্দোলন হয়েছে। সেসব আন্দোলন সর্বব্যাপক হয়নি। যেমন, যখন বিএনপি ক্ষমতায় ছিল, তখন শেখ হাসিনার নেতৃত্বে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের দাবিতে টানা দুই বছর বিক্ষোভ-আন্দোলন হয়েছে। অভ্যুত্থান-গণআন্দোলন বলতে যেটা বোঝায় সেটি হয়নি। এরশাদের বিদায় সম্ভব হয়েছে শুধু গণঅভ্যুত্থানের শক্তির কারণে নয়।

এরপর ১১ পৃষ্ঠায়

যুগের সাথে তাল মিলিয়ে সহজ হচ্ছে সরকারি প্রতিষ্ঠানের সেবা
তারই ধারাবাহিকতায় মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড, ঢাকা এর
সহজিকরণ সেবাসমূহ অনলাইনে খুব সহজেই ঘরে বসে পাওয়া যাচ্ছে

ঢাকা শিক্ষা বোর্ডের সহজিকৃত ই-সেবাসমূহঃ-

- অনলাইনে সমতুল্য সনদের আবেদন
- অনলাইনে নাম ও বয়স সংশোধনের আবেদন
- অনলাইনে ডকুমেন্ট উত্তোলনের আবেদন
- অনলাইনে বিদ্যালয় শাখার আবেদন
- অনলাইনে কলেজ শাখার আবেদন
- অনলাইনে অভিযোগ
- অনলাইনে ফলাফল
- অনলাইনে পুন:নিরীক্ষণ ফল প্রকাশ
- অনলাইনে ইআইআইএন সিমের জন্য আবেদন
- অনলাইনে OEMS এর মাধ্যমে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহের সাথে বোর্ডের যাবতীয় কার্যাবলি সম্পাদন
- অনলাইনে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপন/পাঠদানের আবেদন
- সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের জন্য স্বতন্ত্র ওয়েব পোর্টাল
- অনলাইনে সকল পাবলিক পরীক্ষার সেন্টার ইনফরমেশন
- বার্ষিক কর্মপরিকল্পনা চুক্তি (এপিএ) এর সকল তথ্য সেবাবক্সে হালনাগাদকৃত
- eTC (Online TC)
- eTIF (Teachers information)
- eSIF (Online Registration)
- eFF (Online Form Fill up)
- XI Class Online Admission
- Online Payment & Verification

মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড, ঢাকা
www.dhakaeducationboard.gov.bd
১৩-১৪, জয়নাগ রোড, বকশীবাজার, ঢাকা-১২১১

সিটি ব্যাংক পিএলসি
সিটি ব্যাংক সেন্টার
২৮ গুলশান অ্যাভিনিউ, গুলশান-১, ঢাকা
www.citybankplc.com
কল সেন্টার : ১৬২৩৪

সিটি ব্যাংক™
মেকিং সেন্স অব মানি

সবার জানার সময় এসেছে যে,
এসএমই ব্যাংক হিসেবেও
আমরা এখন দেশের অন্যতম সেরা

SME FINANCE FORUM
বেস্ট ফিন্যান্সিয়ার ফর উইমেন অন্ট্রাপ্রেনার— প্ল্যাটিনাম অ্যাওয়ার্ড
আইএফসি-র দ্যা গ্লোবাল এসএমই ফিন্যান্স অ্যাওয়ার্ড ২০২৪

EUROMONEY AWARDS FOR EXCELLENCE 2024
বেস্ট ব্যাংক ফর এসএমই— বাংলাদেশ
ইউরোমানি অ্যাওয়ার্ড ফর এক্সিলেন্স ২০২৪

ঐতিহ্যগতভাবে শহরমুখী সিটি ব্যাংক এখন হয়ে উঠেছে মফস্বল ও গ্রামবাংলার উন্নয়ন সহযোগী। আমাদের এসএমই সেক্টরে দেওয়া লোন ছুঁয়েছে ৯,০০০ কোটি টাকার পোর্টফোলিও। এর মধ্যে ক্ষুদ্র ব্যবসায়ে গেছে জামানতবিহীন ৪,০০০ কোটি টাকা; আর মাঝারি ব্যবসায়ে ৫,০০০ কোটি। মোট ৩৯,০০০ উদ্যোক্তা পেয়েছেন এসব লোন; আর প্রান্তিক ৩৮৫,৪২০ জন মানুষকে দেওয়া হয়েছে ১,১৮৯ কোটি টাকার সিটি ব্যাংক – বিকাশ ডিজিটাল ন্যানো লোন। এ হিসাবের মধ্যেই আছেন ১১,৬০০ জন নারী উদ্যোক্তা; আছে কৃষি খাতে ১,৪২৫ কোটি টাকার অর্থায়ন।

তাই আইএফসি ও ইউরোমানি থেকে পাওয়া এই পুরস্কার আমাদেরকে আনন্দিত করে, বিস্মিত না।

ছবি :: ফয়সাল সিদ্দিক কাব্য

নতুন বাংলাদেশ গড়ার প্রত্যয়

মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর

প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী আয়োজন

ছাত্র-জনতার অভ্যুত্থানের মুখে গত ৫ আগস্ট ফ্যাসিস্ট শেখ হাসিনা সরকারের পতন হয়। '২৪-এর গণঅভ্যুত্থানের মধ্য দিয়ে বাংলাদেশে হাসিনার যে একদলীয় ও এক ব্যক্তিকেন্দ্রিক লুটেরা স্বৈরশাসন প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল, সেই লুটেরা স্বৈরাচারের পতন ঘটেছে। এই অভ্যুত্থান সরকারি পৃষ্ঠপোষকতায় রাষ্ট্র ও সমাজে জেঁকে বসা দুর্নীতি, লুটপাট, দখলদারিত্ব, অর্থ পাচার, বিচারহীনতা ও ঋণখেলাপি সংস্কৃতির বিরুদ্ধে চ্যালেঞ্জ ছুড়ে দিয়েছে। পাশাপাশি উত্থাপিত হয়েছে রাষ্ট্র সংস্কারের দাবি। সাধারণ মানুষের দীর্ঘদিনের আকাঙ্ক্ষা গণতান্ত্রিক চর্চা করার সুযোগ তৈরি হয়েছে। গণঅভ্যুত্থান এক দিনে হয়নি। এ জন্য বছরের পর বছর, মাসের পর মাস অপেক্ষা করতে হয়েছে। মানুষের ওপর জুলুম করেছে বিগত সরকার। দেশের মানুষ দিনের পর দিন নির্যাতিত হয়েছে। জুলাই-আগস্টে ছাত্র-জনতার আন্দোলনে কে হিন্দু, কে মুসলিম, কে বৌদ্ধ, খ্রিষ্টান– এসব প্রশ্ন ওঠেনি। এই আন্দোলনে কেন্দ্র থেকে তৃণমূলে শিক্ষার্থীদের মধ্যে অভূতপূর্ব ঐক্যবোধ ও সংহতি তৈরি হয়েছিল। বিশ্বাসের পার্থক্য, রাজনৈতিক মতাদর্শের পার্থক্য, ভিন্ন পরিবেশে বেড়ে ওঠা, শ্রেণিগত পার্থক্য– সবকিছু ছাপিয়ে তারা একই উদ্দেশ্যে মিলিত হয়েছিল। তৃতীয় লিঙ্গের মানুষ থেকে শুরু করে সাধারণ খেটে খাওয়া শ্রমজীবী মানুষ যে অভূতপূর্ব ভূমিকা রেখেছেন, তা কোনোভাবে ভুলে যাওয়ার নয়।

গত ১৬ বছরে মানুষের মনে যে ক্ষোভ তৈরি হয়েছে, তারই চূড়ান্ত পরিণতি এ গণঅভ্যুত্থান। উন্নয়ন তত্ত্বকে সামনে নিয়ে বিগত সরকার মানবাধিকার, সুশাসন, জবাবদিহি, ন্যায়বিচার, সর্বোপরি গণতন্ত্রকে নির্বাসনে পাঠিয়েছে। ফ্যাসিস্ট সরকারের সহযোগীরা ব্যাপক আকারে লুটপাট করেছে, ব্যাংক খালি করেছে, বিদেশে অর্থ পাচার করেছে, বিনা কারণে রাজনৈতিক প্রতিপক্ষকে হামলা-মামলায় ব্যস্ত রেখেছে এবং ক্ষমতা চিরস্থায়ী করার মানসে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের বিধান সংবিধান থেকে বাদ দিয়েছে। দুর্ভাগ্যজনকভাবে আমরা এমন কতগুলো কাজ করছি, যার মধ্য দিয়ে ফ্যাসিবাদের ফিরে আসার আশঙ্কা অনেক বেড়ে গেছে। এত দিন ধরে যে ত্যাগ, প্রিয় মানুষের চলে যাওয়া, সবকিছু ছাড়িয়ে ক্রমশ একটা ভয়াবহ অবস্থা তৈরি হচ্ছে। অত্যন্ত পরিকল্পিতভাবে এ অবস্থা তৈরি করছে পতিত ফ্যাসিবাদ। পুরো আন্দোলনকে ভিন্ন দিকে নেওয়ার চেষ্টা করা হচ্ছে। এখন লক্ষ্য একটাই হওয়া উচিত, গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র নির্মাণের জন্য যে সংস্কার প্রয়োজন, তা ন্যূনতম করে সে ধরনের একটা রাষ্ট্র নির্মাণের জন্য নির্বাচনে যাওয়া।

অনেকে বলছেন, নির্বাচনই গণতন্ত্র নয়। অবশ্যই তা নয়। কিন্তু তার জন্য একটা প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে যেতে হবে। গণঅভ্যুত্থানের উদ্দেশ্য কেবল হাসিনা রেজিমের পতন ঘটানোই নয়, একই সঙ্গে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার স্বপ্নকে উজ্জীবিত করাও। আন্দোলনের মধ্য দিয়ে তরুণ প্রজন্মের মধ্যে বৈষম্যবিরোধী চেতনার উন্মেষ ঘটেছে। আন্দোলনের সময় ও এরপর কয়েক লাখ গ্রাফিতি বা দেয়ালচিত্র এঁকেছে শিক্ষার্থীরা। প্রতিটি দেয়ালচিত্রে ফুটে উঠেছে গণঅভ্যুত্থানের গল্প, নতুন বাংলাদেশের স্বপ্ন। স্বপ্নের বাংলাদেশ গড়তে এ বিজয় সংহত করতে হবে। বিজয় অর্জন যতটা সহজ, তাকে সংহত করে সফল পরিণতির দিকে নিয়ে যাওয়া ততটাই কঠিন। ১৬ বছরে জনগণের আত্মত্যাগ বৃথা যেতে পারে না। জনগণ তার প্রত্যাশা থেকে সরে আসেনি। একটি অবাধ ও সুষ্ঠু নির্বাচনের মাধ্যমে গণতন্ত্র ফিরে এলে জনগণের সেই প্রত্যাশা পূরণ হতে পারে। সরকার রাষ্ট্র সংস্কারের কার্যক্রম শুরু করেছে। একটি অনির্বাচিত সরকার ব্যাপকভাবে সংস্কার কতটুকু করতে পারে, সেদিকটিও তাদের ভাবতে হবে। সরকারের কিছু কাজে জনমনে বিভ্রান্তির সুযোগ তৈরি হয়েছে। তাদের কিছু পদক্ষেপ ঘোষণাও বিতর্কের জন্ম দিয়েছে। দ্রব্যমূল্যের লাগামহীন ঊর্ধ্বগতি মানুষকে নাজেহাল করে তুলছে। জনআকাঙ্ক্ষা অনুযায়ী নির্বাচন ছাড়া অন্তর্বর্তী সরকারের দুটি সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অগ্রাধিকার ছিল জনজীবনে স্বস্তি ও নিরাপত্তা বিধান করা। এ জন্য সরকারের প্রচেষ্টা রয়েছে। কিন্তু বাজার পরিস্থিতি এখনও বেসামাল। জনজীবনে নিরাপত্তাহীনতা উদ্বেগজনক অবস্থায় রয়েছে। আইনশৃঙ্খলা রক্ষা বাহিনীসহ প্রশাসনকে এখনও পুরোপুরি কার্যকর করা যায়নি। উপদেষ্টাদের মধ্যে নানা কথা শুনে মনে হয়, তাদের মধ্যে সমন্বয়হীনতাও আছে। আন্দোলনের দাবিদার কোনো কোনো অংশ এমন আচরণ করছে যে তাতে মানুষের স্বস্তি আসছে না, বরং বিরক্তি বাড়ছে।

আজ দেশের অবস্থা দেখে অনেকে আতঙ্কিত, উদ্বিগ্ন। এগুলো কী হচ্ছে? আমাদের বুঝতে হবে, আমাদের সেই শত্রুরা যারা সামনে থেকে চলে গেছে, এখন তারা পেছনে থেকে দেশকে আবার অস্থির করে তুলছে। আমাদের সজাগ থেকে ধৈর্য ধরতে হবে। ফ্যাসিবাদ পরাজিত হলেও যে কোনো সময় তা আবার ফিরে আসতে পারে। আমরা সেই রাস্তা যেন তৈরি করে না দিই। আমি মনে করি, এই সরকার ব্যর্থ হলে অভ্যুত্থান ব্যর্থ হয়ে যাবে, বিপ্লব ব্যর্থ হয়ে যাবে, আমরা আবার সেই অন্ধকারে চলে যাব। তাই আমাদের অন্তর্বর্তী সরকারকে সহযোগিতা করতে হবে বলে মনে করি। তবে শঙ্কার সঙ্গে লক্ষ্য করছি সংবাদপত্রের ওপর, স্বাধীন মতপ্রকাশের ওপর আঘাত শুরু হয়েছে। যার জন্য আমরা সব সময় সংগ্রাম করেছি, লড়াই করেছি। স্বাধীনতা-উত্তর বাংলাদেশে অবাধ লুটপাট, ব্যাংক ডাকাতি আর দুর্নীতির কারণে তলাবিহীন ঝুড়ি হিসেবে পরিচিতি পাওয়া দেশকে স্বাবলম্বী করে তুলেছিলেন শহীদ প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান। আধিপত্যবাদী শক্তির থাবা মুক্ত করে আন্তর্জাতিক বিশ্বে বাংলাদেশকে নিজ মর্যাদায় সমাসীন করেছিলেন। জিয়াউর রহমানের নেতৃত্বেই সুসংহত হয়েছিল দেশের স্বাধীনতা-সার্বভৌমত্ব। দেশে গণতন্ত্র পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। নৈরাজ্যমুক্ত হয়েছিল দেশ। রাষ্ট্র ও সমাজের সর্বক্ষেত্রে জবাবদিহি প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। জনগণ ফিরে পেয়েছিল বাক-ব্যক্তিস্বাধীনতা ও ভোটাধিকার। সংবাদপত্র সবচেয়ে বেশি স্বাধীনতা ভোগ করেছে বিএনপির সময়ে। এখন অনেকেই রাষ্ট্র সংস্কারের কথা বলছেন। বলছেন সংবিধান সংস্কার করতে হবে। সংবিধান পরিবর্তন কীভাবে করবেন? একটা সংস্কার কমিটি দিয়েই সংবিধান সংস্কার হবে না। ওটা করতে গেলে সাংবিধানিক কিংবা সংসদের প্রতিনিধি লাগবে। সেটার জন্য ধৈর্য ধরতে হবে। একই সঙ্গে সবচেয়ে প্রধান যে জিনিসটা দরকার, সেটি হলো নির্বাচন। নির্বাচন যত দ্রুত হবে দেশের জন্য ততই মঙ্গল। সমস্যা ততই কমে আসবে। নির্বাচিত সরকার হলে তার শক্তি হবে জনগণ।

মনে রাখতে হবে একদিকে যেমন পরিবর্তনের জন্য জীবন দিয়েছে, তেমনি নির্বাচনের জন্য মানুষ প্রাণ দিয়েছে। হঠাৎ করেই কোনো কিছু পরিবর্তন করে ফেললে হবে না। সেটা কতটা টেকসই, সেই চিন্তাও করতে হবে। তার জন্য গণতান্ত্রিক পথে যেতে হবে। যারা এই গণঅভ্যুত্থানের নেতৃত্ব দিয়েছিল, তারা যদি বলত বিপ্লবী সরকার গঠন করেছি, তাহলে বিপ্লবী সরকার করত। আমাদের কিছু বলার ছিল না। এটা (অন্তর্বর্তী সরকার) বিপ্লবী সরকার নয়, সাংবিধানিক সরকার। আপিল বিভাগ থেকে এই সরকারের বৈধতা নেওয়া হয়েছে। ওটাকে ধরে রেখেই আমাদের এগোতে হবে। একটা গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র পুনর্গঠনে বাংলাদেশের চলমান সংবিধানে বৈপ্লবিক পরিবর্তন আনাও অপরিহার্য। যাতে এ সংবিধানকে সহজে ব্যবহার ও সংশোধন করে ভবিষ্যতে ক্ষমতাসীনরা আবার স্বৈরাচারী ও ফ্যাসিবাদী নিপীড়ন-নির্যাতন শুরু করে দিতে না পারে। এ লক্ষ্যে বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল ২০২৩ সালের জুলাই মাসে ৩১ দফা ও ২০২৪ সালের নভেম্বর মাসে ৬২ দফা প্রস্তাব দিয়েছে।

গণঅভ্যুত্থানের মধ্য দিয়ে গঠিত অন্তর্বর্তী সরকার নানা চ্যালেঞ্জের মধ্যে পড়েছে দায়িত্ব গ্রহণের পর থেকেই। রাষ্ট্রের এমন কোনো বিভাগ নেই, যেখানে অনিয়ম, অব্যবস্থাপনা নেই। সরকার পরিচালনার বড় চ্যালেঞ্জ হচ্ছে অতীতের স্বৈরাচারী সরকারের সহযোগী ও সুবিধাভোগী প্রশাসনকে নিয়েই সরকার চালানো। প্রধান উপদেষ্টা ইতোমধ্যে উদার, গণতান্ত্রিক, অসাম্প্রদায়িক, বৈষম্যমুক্ত সমৃদ্ধ বাংলাদেশ গড়ার কথা বলেছেন। সে লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় সংস্কারের উদ্দেশ্যে ১০টি কমিশন গঠন করা হয়েছে। সংস্কারের জন্য দেশপ্রেমিক সবাইকে ঐক্যবদ্ধ হতে হবে, এই সুযোগ আর আসবে না। আমরা আশা করি, যে প্রত্যাশা নিয়ে সবাই আন্দোলন করেছে, রক্ত দিয়েছে, সে প্রত্যাশা আমাদের পূরণ হবে। জুলাই গণঅভ্যুত্থান আমাদের আত্মমর্যাদা নিয়ে দাঁড়াতে শিখিয়েছে। এ আত্মবিশ্বাস নিয়ে আমরা বাংলাদেশকে নতুনভাবে গড়তে পারব।

আমাদের সামনে বড় ক্রান্তিকাল। ঐক্যবদ্ধভাবে আমরা ফ্যাসিস্টকে বিদায় দিয়েছি। আমাদের ঐক্য ধরে রাখতে হবে। আমাদের সঠিকভাবে রূপান্তর ঘটাতে হবে। যে রূপান্তরের মধ্য দিয়ে গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ, চেতনাকে ফিরিয়ে এনে সত্যিকারের গণতান্ত্রিক, মানবিক মূল্যবোধ, কল্যাণকর দেশ গড়তে পারি। আমাদের সামনে এটাই লক্ষ্য। গণতান্ত্রিক, মানবিক মূল্যবোধসম্পন্ন সমাজ বিনির্মাণের লক্ষ্যে একাত্তরে মুক্তিযুদ্ধ হয়েছিল। মুক্তিযুদ্ধের মধ্য দিয়ে আমরা এই ভূখণ্ড পেয়েছি। গণতন্ত্রের জন্য যুদ্ধ করেছি, দেশ স্বাধীন করেছি। ৩০ লাখ শহীদ, দুই লাখ মা-বোন সম্ভ্রম দিয়েছেন। সেই গণতন্ত্র আওয়ামী লীগ ধ্বংস করেছে।

অনেকে একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধকে বাদ দিয়ে চিন্তা করতে চায়। এটা অন্যায়। শহীদের স্বপ্ন বাস্তবায়ন করার জন্য আমরা যে বিজয় পেয়েছি, তা ধরে রাখতে হবে এবং এরপর কোনো সরকার যাতে ফ্যাসিস্ট ব্যবস্থা চালু করতে না পারে, সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে। ছাত্র-জনতার রক্তের বিনিময়ে অর্জিত নতুন বাংলাদেশ যেন হারিয়ে না যায়। সে জন্য আমাদের সবাইকে ঐক্যবদ্ধভাবে এই অন্তর্বর্তী সরকারকে সহায়তা করতে হবে। একই সঙ্গে তাদের দুর্বল দিকগুলো আমাদের ধরিয়ে দিতে হবে।

ন্যায়বিচার আর ন্যায্যতাভিত্তিক সমাজের অধিকার ধনী-গরিব প্রত্যেক মানুষের রয়েছে। বিগত দিনের অন্যায় আর অন্যায্যতাকে ভুলে যাওয়া চলবে না। আগামীর বাংলাদেশ যেন হয় তারুণ্যনির্ভর, সম্প্রীতিপূর্ণ, ন্যায়বিচারের বাংলাদেশ। আমরা সেই বাংলাদেশ গড়ব, যা আমাদের একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধের ও ২০২৪ সালের গণঅভ্যুত্থানের শহীদদের স্বপ্ন ছিল। ❖

মহাসচিব
বিএনপি

চব্বিশের গণঅভ্যুত্থান : পটভূমি ও অভিমুখ

আবু সাঈদ খান

প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী আয়োজন

ক্ষমতাচ্যুত প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার জমানায় আলোচিত অনুষ্ঠান ছিল সংবাদ সম্মেলন। না, সংবাদ সম্মেলন বলা যাবে না। সংবাদ সম্মেলনের নামে প্রধানমন্ত্রীর অনুগ্রহভাজন, পত্রিকার সম্পাদক, মালিক, টেলিভিশনের এমডি, সিইও, সাংবাদিক নেতাসহ মিডিয়া হোমরাচোমরাদের আসর বসত। অবশ্য শেখ হাসিনার অতি আদরের দু-চারজন পুঁচকে সাংবাদিকও আমন্ত্রিত হতেন।

বিদেশ সফরে শেখ হাসিনা ছিলেন চ্যাম্পিয়ন। যেখানে সচিব গেলে চলত। সেখানে তিনিই হাজির হতেন। সাধারণত প্রধানমন্ত্রীর বিদেশ সফর শেষে ফিরে আসার দু-এক দিন পর 'সংবাদ সম্মেলন' হতো।

প্রতিবেশী দেশ ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি সাংবাদিকদের এড়িয়ে চলেন। সাংবাদিকদের মুখোমুখি হন না। কারণ, সেখানকার সাংবাদিকরা বড্ড বেয়াড়া! তারা 'উল্টাপাল্টা' প্রশ্ন করে নাস্তানাবুদ করে ফেলতে পারেন। মোদি তাঁর দেশের সব সাংবাদিককে বশ করতে পারেননি। যেটি শেখ হাসিনা অনেকাংশে পেরেছিলেন। তিনি মিডিয়া মালিক-সম্পাদক-সাংবাদিকের একাংশকে হাতের মুঠোয় পুরেছিলেন। এসব অনুগত সাংবাদিকই পেতেন প্রধানমন্ত্রীর সংবাদ সম্মেলন বা রাষ্ট্রীয় অনুষ্ঠানে প্রবেশাধিকার। বেয়াড়া সাংবাদিকদের সেখানে ঢোকার ছাড়পত্র ছিল না।

সংবাদ সম্মেলনে প্রধানমন্ত্রী হাসিমুখে বিদেশ সফরের 'সাফল্যগাথা' বয়ান করতেন। তারপর শুরু হতো প্রধানমন্ত্রীর গুণকীর্তন। তাঁকে বঙ্গবন্ধুর সুযোগ্য কন্যা, গণতন্ত্রের মানসকন্যা, জাতির ত্রাতা, উন্নয়নের রোল মডেল নির্মাতা, বঙ্গরত্ন, বিশ্বনেতা, হবু নোবেল লরিয়েট ইত্যাদিতে ভূষিত করা হতো। তাঁর মেধা, কর্মক্ষমতা, স্মার্টনেস, শাড়ির রং ও সাজগোজ নিয়ে প্রশংসা চলত। সেই সঙ্গে চলত খালেদা জিয়াসহ বিরোধী দলের নেতাদের, এমনকি বুদ্ধিজীবীদের নিয়ে ঠাট্টা-মশকরা, উপহাস। এসব সংবাদ সম্মেলনের মধ্য দিয়ে ফুটে উঠত একজন দাম্ভিক, নিষ্ঠুর, অতিমাত্রায় কর্তৃত্ববাদী ও স্বৈরশাসকের অবয়ব।

গত ১৬ বছর বেতার-টেলিভিশন-পত্রপত্রিকায় শেখ হাসিনা ও তাঁর পরিবারের সদস্যদের স্তুতি হতো। মন্ত্রী-নেতা-আমলা সমস্বরে শেখ পরিবারের বন্দনা করতেন। পঞ্চদশ সংশোধনীতে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে জাতির পিতা করা হয়। শেখ মুজিবের নামের আগে 'জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু' না বললে খেসারত দিতে হতো। বেগম মুজিবের নামের আগে 'বঙ্গমাতা' বলতে হতো। শেখ মুজিবের নামে ৯টি বিশ্ববিদ্যালয়ের নামকরণ করা হয়েছিল; শেখ হাসিনা, শেখ কামাল ও রাসেলের নামে ক্যান্টনমেন্টের নামকরণ করা হয়েছিল। শেখ পরিবারের নামে দেশজুড়ে ছিল অসংখ্য প্রতিষ্ঠান। অফিস-আদালত, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, বিমানবন্দরে মুজিব কর্নার করা হয়েছিল, স্কুল-কলেজে রাসেল ল্যাব করা হয়েছিল। শেখ মুজিবের অসংখ্য ভাস্কর্য-ম্যুরাল করা হয়েছিল, মুজিব-হাসিনা-কামাল-রাসেলের ছবিতে দেশ ছেয়ে গিয়েছিল। বিমানবন্দরসহ গুরুত্বপূর্ণ স্থানে লেখা হয়েছিল, মুজিবের দেশ।

এটি ধ্রুবসত্য যে, শেখ মুজিবুর রহমান আমাদের মুক্তিসংগ্রামের প্রধান নেতা। ১৯৬৬ থেকে ১৯৭১ সাল তিনিই মুক্তিসংগ্রামের মুখপাত্র। ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানসহ তাঁর পরিবারের সদস্যদের হত্যা করা হয়। তারপর থেকে তিনিসহ মুক্তিসংগ্রামীদের নাম কোনো রাষ্ট্রীয় অনুষ্ঠান বা বেতার-টেলিভিশনে উচ্চারিত হতো না। পাঠ্যপুস্তকেও ছিল না। ১৯৯৬ সালে আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় আসার পর শেখ মুজিবুর রহমান আর উপেক্ষিত থাকলেন না। তিনি স্বমহিমায় আবির্ভূত হলেন। নতুন প্রজন্ম বেতার টেলিভিশনে প্রথম ৭ মার্চের ঐতিহাসিক ভাষণ শুনে উদ্বেলিত হলো। তবে শেখ মুজিবকে বড় করতে গিয়ে ইতিহাসের অন্য নায়কদের ছোট করা হলো।

একাত্তরে শেখ মুজিব ছিলেন পাকিস্তানের কারাগারে বন্দি। তাঁর অবর্তমানে তাজউদ্দীন আহমদই সশস্ত্র মুক্তিযুদ্ধের নেতৃত্ব দিয়েছিলেন। শেখ হাসিনার জমানায় তাজউদ্দীন ও মুজিবনগর সরকারের নায়করা ছিলেন ব্রাত্য। শেরেবাংলা আবুল কাশেম ফজলুল হক, মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী, শামসুল হক, মণি সিংহ প্রমুখের অবদান কখনও উল্লেখ করা হতো না। শেখ হাসিনাসহ তাঁর সাঙ্গোপাঙ্গরা জিয়াউর রহমানকে পাকিস্তানের এজেন্ট, সিরাজুল আলম খানকে ষড়যন্ত্রকারী বলতেও দ্বিধা করতেন না।

ইতিহাসের নতুন বয়ান তৈরি করা হয়। বেতার-টেলিভিশন ও সংবাদপত্রে অনুগত সাংবাদিক-শিক্ষক-সাহিত্যিকের কণ্ঠে প্রচার করা হতো যে, ১৯৭১ সালের ২৫ মার্চের পর বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের আহ্বানে সমগ্র জাতি মুক্তিযুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়ল। ৯ মাস যুদ্ধের মধ্য দিয়ে স্বাধীনতা এলো। বলা হতো না যে, এই সশস্ত্র মুক্তিযুদ্ধ কীভাবে শুরু হলো, কারা নেতৃত্ব দিলেন, রণাঙ্গনে কারা ছিলেন। ঘুণাক্ষরেও উচ্চারিত হতো না যে, কীভাবে জাতীয় পতাকা তৈরি হয়েছিল, কে বা কারা জাতীয় সংগীত নির্ধারণ করেছিলেন। কারা, কখন জয় বাংলা স্লোগান দিয়েছিলেন। সবকিছুই চাপা পড়ল। শেখ হাসিনার জমানায় বেগম মুজিব, শেখ কামাল, রাসেল প্রমুখের জন্মদিনও জাতীয়ভাবে পালিত হতো। অথচ ১৭ এপ্রিল মুজিবনগর দিবস ছিল উপেক্ষিত।

প্রসঙ্গত, জর্জ ওয়াশিংটন যুক্তরাষ্ট্রের স্বাধীনতার প্রধান নেতা। তবে তিনি এককভাবে জাতির পিতা হিসেবে স্বীকৃত নন। তিনি ও তাঁর অন্য ছয় সহযোদ্ধা (টমাস জেফারসন, জন অ্যাডামস, বেঞ্জামিন ফ্রাঙ্কলিন, আলেকজান্ডার হ্যামিল্টন, জন জে ও জেমস মেডিসন) যুক্তরাষ্ট্রের প্রধান ফাউন্ডিং ফাদার। এর বাইরে সংগ্রামে ঐতিহাসিক ভূমিকা পালন করেছেন, এমন গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিদের ফাউন্ডিং ফাদার হিসেবে সম্মানিত করা হয়। এ উপমা তুলে ধরায় অনেকে শেখ হাসিনার আক্রমণের নিশানায় পরিণত হয়েছিলেন।

এখন প্রশ্ন হচ্ছে, শেখ হাসিনার সরকার কী করে ১৬ বছর ক্ষমতায় টিকে থাকতে পারল? কী ছিল এর রহস্য? ১৯৯৬ সালে শেখ হাসিনার নেতৃত্বে আওয়ামী লীগ সরকার গঠন করে। তখন আওয়ামী লীগ ছিল অনেকটা সংযত। জনমতের বিষয়টি তাদের বিবেচনায় ছিল। ২০০৯ সালে ক্ষমতায় এসে আওয়ামী লীগ বদলে যায়। ক্ষমতা ধরে রাখতে অর্থ ও মাস্তানির পথ অবলম্বন করে। ছাত্রলীগ, যুবলীগ, স্বেচ্ছাসেবক লীগ হয়ে উঠল শেখ হাসিনার লাঠিয়াল। লাঠিয়াল বাহিনীতে পরিণত হলো পুলিশও। প্রশাসন, আদালত, বিশ্ববিদ্যালয়, সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠান, বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান সর্বত্রই বসানো হলো শেখ হাসিনার নিজের লোক। দলীয়করণের এক উলঙ্গ চিত্র।

পরিকল্পিত লুটপাটও ছিল সরকারের লক্ষ্য। এ ক্ষেত্রে সোহেল তাজের মন্তব্য প্রাসঙ্গিক। সেটি হলো– ২০০৯ সালে ক্ষমতায় আসার পর শেখ হাসিনা বলেন যে, বিএনপি টাকা বানিয়েছে, আমাদেরও অনেক টাকা বানাতে হবে। এ কথার পর সোহেল তাজ শেখ হাসিনার প্রতি শ্রদ্ধা হারান।

২০০৯ সালে ক্ষমতায় এসে কর্মীদের অর্থ কামাইয়ের সুবিধা করিয়ে দিতে গুরুত্ব দেওয়া হলো অবকাঠামো উন্নয়নের ওপর। গড়ে উঠল অনেক প্রয়োজনীয়-অপ্রয়োজনীয় সড়ক, ভবনসহ নানা স্থাপনা। এই প্রক্রিয়ার অংশ হিসেবে ব্যাংকগুলো শেখ হাসিনার অনুগত কতিপয় পরিবারের কাছে তুলে দেওয়া হলো। নিয়মবহির্ভূত ঋণ নিয়ে ব্যাংকগুলো ফোকলা করে বিদেশে হাজার হাজার কোটি টাকা পাচার করা হলো। এই লুটপাটের সঙ্গে শেখ হাসিনা ও তাঁর পরিবারের যে যোগসূত্র ছিল, তা আজ আর গোপন নেই। মেগা প্রজেক্টে মেগা চুরির মাধ্যমে নেতাদের একাংশ ফুলেফেঁপে উঠল। বলা বাহুল্য, বিএনপির আমলেও দুর্নীতি ছিল। তবে শেখ হাসিনার আমলের তুলনায় তা নস্যি।

এমনই দখলবাজি, চাঁদাবাজির মধ্য দিয়ে যে ধনিক গোষ্ঠী জন্ম নিল; তাদের অনেকেই দেশে টাকা রাখল না, হাজার হাজার কোটি টাকা বিদেশে পাচার হয়ে গেল। ড. দেবপ্রিয় ভট্টাচার্যের নেতৃত্বাধীন শ্বেতপত্র প্রণয়ন কমিটির হিসাবে শেখ হাসিনার শাসনের ১৫ বছরে বিদেশে পাচার হয়েছে ২৮ লাখ কোটি টাকা; যা বাংলাদেশের প্রায় পাঁচটি বাজেটের সমান। এ টাকায় মন্ত্রী-এমপি-আমলা মালয়েশিয়ায় সেকেন্ড হোম, কানাডায় বেগমপাড়া, সিঙ্গাপুর-দুবাই-লন্ডন-সিডনি-নিউইয়র্কের অভিজাত এলাকায় প্রাসাদোপম বাড়ি কিনেছেন, বিদেশে রাজকীয় জীবনযাপন করছেন। আলজাজিরার হিসাব মতে, সাবেক ভূমিমন্ত্রী সাইফুজ্জামান চৌধুরীর যুক্তরাজ্য, যুক্তরাষ্ট্র, আরব আমিরাতসহ নানা শহরে ৬২০টি বাড়ি রয়েছে; যার বাজারমূল্য প্রায় ৪৮ কোটি ডলার অর্থাৎ ৫ হাজার ৪৬০ কোটি টাকা। অন্যদিকে ১৬ বছরের নির্মম শাসন-শোষণে নিম্নমধ্যবিত্ত, নিম্নবিত্ত, বিত্তহীনদের জীবনে সীমাহীন দুর্ভোগ নেমে আসে। দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি, মুদ্রাস্ফীতি, চাঁদাবাজি, দখলবাজি ইত্যাদিতে জনজীবন হয়ে ওঠে অতিষ্ঠ।

শেখ হাসিনার শাসনামলজুড়ে রয়েছে রাজনৈতিক হত্যাকাণ্ড, গুম ও আয়নাঘরে নির্যাতনের বহু বর্বরোচিত কাহিনি। অসংখ্য রাজনৈতিক নেতাকর্মী-সাংবাদিক-মানবাধিকার কর্মী জেল-জুলুম-নিপীড়নের শিকার হয়েছেন। বিরোধী দলের সভা-সমাবেশের অধিকার কেড়ে নেওয়া হয়। কয়েক লাখ বিএনপির নেতাকর্মী ও সমর্থকদের বিরুদ্ধে মামলা তাদের স্বাভাবিক জীবন বিপন্ন করে তুলেছিল। কোনো কোনো নেতার বিরুদ্ধে কয়েকশ করে মামলা ছিল। প্রায় প্রতিদিনই একাধিক মামলায় হাজিরা দিতে হতো। আদালতপাড়াই হয়ে দাঁড়িয়েছিল তাদের ঠিকানা।

বাক-ব্যক্তি-সংবাদপত্রের স্বাধীনতার ওপর ছিল সাইবার সিকিউরিটি অ্যাক্টসহ নানা কালাকানুনের খড়্গ। প্রসঙ্গক্রমে, ২০২০ সালে এক অভিযোগে ডিজিটাল নিরাপত্তা আইনে লেখক মোশতাক ও কার্টুনিস্ট কিশোরকে জেলে পুরা হলো। বারবার তাদের জামিন প্রত্যাখ্যাত হলো। রিমান্ড-নির্যাতনে ক্ষতবিক্ষত মোশতাকের জীবনপ্রদীপ নিভে গেল। এর এক সপ্তাহ পর কিশোর মুক্তি পান, কিন্তু অমানুষিক নির্যাতনের ক্ষত এখনও বয়ে বেড়াচ্ছেন। একজন কিশোরই নয়; কাজল, খাদিজাসহ অনেকেই সাইবার নিরাপত্তা আইনের নির্মম শিকার হয়েছেন। ভিন্ন মতপ্রকাশের স্বাধীনতায় আগেও বাধা ছিল, তবে শেখ হাসিনার ১৬ বছর এর নিকৃষ্টতম উদাহরণ।

নিরপেক্ষ নির্বাচনের পথ রুদ্ধ করে দেওয়া হয় পঞ্চদশ সংশোধনীর মাধ্যমে তত্ত্বাবধায়ক সরকার বিধান বাতিল করার মধ্য দিয়ে। ২০১৪ সালে দলীয় সরকারের অধীনে নির্বাচন হলো। সংগত কারণেই বিএনপিসহ সব বিরোধী দল নির্বাচন বর্জন করল। নির্বাচনে ১৫৩ জনকে বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচিত করা হলো। ২০১৮ সালে ড. কামাল হোসেনের নেতৃত্বে বিএনপিসহ বিভিন্ন দল নিয়ে গঠিত জাতীয় ঐক্য ফ্রন্ট নির্বাচনে অংশ নিল। তবে ভোটের আগের রাতে নৌকায় সিল মেরে বাক্স ভর্তি করা হলো। ২০২৪ সালের নির্বাচনে আওয়ামী লীগ ও তার সহযোগী ছাড়া আর কোনো দল ছিল না। এ নির্বাচনকে সবাই উপহাস করে বলত– আমি আর ডামির নির্বাচন। পরপর তিনটি নির্বাচন প্রহসনে পরিণত হলো। এভাবেই কায়েম হলো পরিবারতন্ত্র ও গোষ্ঠীতন্ত্র।

বাকশালও ছিল একনায়কি শাসন, পরিবার ও গোষ্ঠীতান্ত্রিক শাসন। ১৯৭২ সালে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান যখন পাকিস্তানের কারাগার থেকে মুক্ত হয়ে ফিরলেন, তখন তাঁর আকাশচুম্বী জনপ্রিয়তা। তিন বছরের মাথায় অনিয়ম, অব্যবস্থা, অদক্ষতা, খুন, দুর্ভিক্ষ, রক্ষীবাহিনীর নির্যাতন, লুটপাটে সৃষ্ট পরিস্থিতিতে তা তলানিতে নেমে এল। তিনি দেখলেন পায়ের তলায় মাটি নেই। তাই ক্ষমতা কুক্ষিগত করতে 'বৈষম্যহীন সমাজের দোহাই দেড়ে চাপিয়ে দেওয়া হলো অগণতান্ত্রিক বাকশালী শাসন। শেখ হাসিনা সেই শাসন ফিরিয়ে আনলেন ভিন্ন কৌশলে, ভিন্ন অবয়বে। শেখ মুজিবের ঘোষিত বাকশালের চেয়ে শেখ হাসিনার অঘোষিত 'বাকশাল' ভয়ংকর।

বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের মর্মকথা ছিল অযৌক্তিক কোটা নয়, মেধার ভিত্তিতে চাকরি পাওয়ার অধিকার। সেই আন্দোলন আর সেখানে থাকেনি। ক্ষোভ ও যন্ত্রণায় ক্লিষ্ট সুবিধাবঞ্চিত বস্তিবাসী, শ্রমিক, রিকশাওয়ালা, ফেরিওয়ালা, দোকানি, কেরানিসহ নানা পেশা ও শ্রেণির মানুষ বৈষম্যবিরোধী শিক্ষার্থীদের মিছিলে যোগ দিল। বিএনপি, বাম ও ইসলামী দলের কর্মীরাও মিছিলে একাকার হলো। জনগণের ক্ষোভ বাড়িয়ে দিয়েছিল ভোট দিতে না পারার যন্ত্রণা, সেবা খাতের অব্যবস্থা ও পীড়ন এবং পুলিশ ও ছাত্রলীগ-যুবলীগ-স্বেচ্ছাসেবক লীগের নির্যাতন। দিনে দিনে জমে ওঠা পুঞ্জীভূত ক্ষোভ থেকে গণবিস্ফোরণ, জুলাই-আগস্টের গণঅভ্যুত্থান।

বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের পথিকৃত বিএনপি, গণতন্ত্র মঞ্চ, বাম গণতান্ত্রিক জোট, ফ্যাসিবাদ-বিরোধী বাম মঞ্চ, জামায়াতে ইসলামী, হেফাজতে ইসলামসহ বেশির ভাগ দল আন্দোলনে যোগ দিয়েছিল। অংশ নিয়েছিল লেখক-শিল্পী-সাংবাদিক-বুদ্ধিজীবীদের একটি ক্ষুদ্র অংশ। তবে ছাত্র-জনতাই অভ্যুত্থানের মূল শক্তি। এটিকে বলা যায়, স্বতঃস্ফূর্ত গণজাগরণ।

অভ্যুত্থানকে অনেকেই বিপ্লব বলছেন। তবে চূড়ান্ত বিচারে এটি বিপ্লব নয়। বিপ্লব আর্থসামাজিক ব্যবস্থা বদলে দেয়; যেমনটি দিয়েছিল রাশিয়ার অক্টোবর বিপ্লব। ফরাসি বিপ্লবও নতুন রাজনৈতিক দর্শনের ঝান্ডা তুলে ধরেছিল।

এটিকে দ্বিতীয় স্বাধীনতা বলার যুক্তি নেই। স্বাধীনতা একবারই এসেছে লাখো শহীদের রক্তের বিনিময়ে; যা আমাদের দিয়েছে মানচিত্র, জাতীয় পতাকা, জাতীয় সংগীত ও সংবিধান। এসব সমুন্নত রেখেই পথ চলতে হবে। তবে সংবিধানে যে কালাকানুনের কালো ছায়া পড়েছে তা মুছে ফেলতে হবে।

জুলাই-আগস্টের গণঅভ্যুত্থান নিঃসন্দেহে অনন্য ঘটনা। এভাবে বন্দুকের সামনে সহস্রাধিক নরনারী আত্মদানের ঘটনা ইতিহাসে বিরল। এ অভ্যুত্থান নবজাগরণ এনেছে। জাতীয় ঐক্যের বাতাবরণ তৈরি করেছে। বাঙালি আদিবাসী, প্যান্ট-শার্ট পরা বিশ্ববিদ্যালয়-কলেজ পড়ুয়া ও টুপি-লম্বা কোর্তা পরা মাদ্রাসা পড়ুয়াদের এক মিছিলে দাঁড় করিয়েছে। আন্দোলনের মিছিলে নারীর উপস্থিতি ছিল ব্যাপক; যা অন্তর্ভুক্তিমূলক সমাজ ও রাষ্ট্রের অপরিহার্য উপাদান। আমাদের সমাজে মানুষে মানুষে, ধর্মে বর্ণে যে দূরত্ব তৈরি ছিল, তা ঘুচিয়ে দিয়েছে অভ্যুত্থান।

অভ্যুত্থানের ফসল ড. মুহাম্মদ ইউনূসের নেতৃত্বাধীন অন্তর্বর্তী সরকার। জনআকাঙ্ক্ষা বাস্তবায়নের দায়িত্ব বর্তেছে তাদের ওপর। সরকারকে খতিয়ে দেখতে হবে, অভ্যুত্থানে অংশগ্রহণকারী ছাত্র-জনতা কী চেয়েছিল, এখনই-বা কী চাইছে? ছাত্র-জনতার মোটাদাগে চাওয়া– বৈষম্যের অবসান, শান্তি, স্বস্তি, 'আমার ভোট আমি দেব' অধিকার।

আশার কথা, তিন মাসে অর্থনীতিতে খানিকটা গতি ফিরেছে। ব্যাংকের ওপর জনগণ আস্থা হারিয়েছিল, তা কিছুটা কেটেছে। রেমিট্যান্স প্রবাহ বেড়েছে। কিন্তু নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যের বাজার নিয়ন্ত্রণে নেই। সিন্ডিকেট এখনও সক্রিয়। অস্থিরতা থামছে না। পরিস্থিতি উত্তপ্ত করে তুলেছে 'মব জাস্টিস'। ছাত্রদের মধ্যে বিভাজন। ঘটছে নানা অনাকাঙ্ক্ষিত ঘটনা।

পুলিশ-প্রশাসন পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণ করতে পারছে না। এখনও পুলিশ সক্রিয় নয়। প্রশাসন ঢিমেতালে। জনমনে প্রশ্ন, অন্তর্বর্তী সরকার পারবে তো পরিস্থিতি সামাল দিতে, জনআকাঙ্ক্ষা পূরণ করতে? ১৬ বছরের জঞ্জাল সরাতে, কাঙ্ক্ষিত সংস্কার আনতে?

এ সরকারকে জনআকাঙ্ক্ষা পূরণ করতেই হবে। ব্যর্থ হতে দেওয়া যায় না। কারণ, এ সরকারের ব্যর্থতা হবে জনগণের ব্যর্থ হওয়ারই নামান্তর। ❖

মুক্তিযোদ্ধা, সাংবাদিক ও গবেষক

SHAKTI

নির্মল বাতাসে বেড়ে উঠুক আগামী প্রজন্ম

জনসচেতনতায় শক্তি ফাউন্ডেশন

মাত্র ১৪ দিনের ব্যবধানে শক্তি ফাউন্ডেশনের বায়ুদূষণ নির্দেশক কৃত্রিম ফুসফুসের পরিবর্তন

১ম দিন | ১৪ তম দিন

*এয়ার কোয়ালিটি ইনডেক্স (একিউআই)

এই বাতাসে শ্বাস নিয়েছেন আপনি, আপনার সন্তান, আপনার বাবা-মা।
ভেবে দেখুন, বায়ুদূষণ তাহলে তাদের ফুসফুসের কতটা ক্ষতি করছে!

অক্টোবর ২০২৪, ঢাকার বায়ুদূষণের মাত্রা ছিল অস্বাস্থ্যকর (একিউআই ১৫১-২০০)।
যার মানে আপনি না জেনেই প্রতিদিন
৩.৪টি সিগারেটের সমান দূষিত বায়ু গ্রহণ করেছেন।

আসুন, আমরা সবাই মিলে বায়ুদূষণ রোধে একসাথে কাজ করি।
সবুজ বাংলাদেশ গড়ি।

প্রধান কার্যালয়
শক্তি ভবন, বাড়ি নং-০৪, রোড নং -০১, ব্লক-এ,
সেকশন-১১, মিরপুর, পল্লবী, ঢাকা - ১২১৬

+৮৮ ০৯৬১৩-৮৮৮১১১
+৮৮ ০২-৫৮০৫২০৩১
+৮৮ ০১৮ ১৯৮৫০১৪৮

shakti.org.bd
/SFDWbd
/company/sfdwbd

সঞ্চয়ের বৃদ্ধি ও নিরাপত্তায় আস্থা রাখুন ঢাকা ব্যাংক অফশোর ব্যাংকিং-এ

এখন বাংলাদেশেই বৈদেশিক মুদ্রায় সঞ্চয়/ বিনিয়োগে আপনি পাচ্ছেন সর্বোচ্চ মুনাফা

বিদেশে বসবাসরত যে কোন বাংলাদেশী নাগরিক/ বিদেশী নাগরিক/ বিদেশে নিবন্ধিত এবং পরিচালিত প্রতিষ্ঠান নিজে অথবা তারপক্ষে বাংলাদেশে মনোনীত ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান ডলারে বা ইউরোতে ঢাকা ব্যাংক অফশোর টার্ম ডিপোজিট অ্যাকাউন্ট খুলুন

মুনাফা উপভোগ করুন বছরে সর্বোচ্চ **৮.৪৫%*** (সম্পূর্ণ কর মুক্ত)*

ঢাকা ব্যাংক অফশোর টার্ম ডিপোজিট অ্যাকাউন্ট-এ আরো পাচ্ছেন:

- ০৩ মাস থেকে ০৫ বছর পর্যন্ত বিভিন্ন মেয়াদের সুবিধা
- চার্জ ফ্রি ব্যাংকিং
- মুনাফাসহ মূলধন দেশে খরচ বা বিদেশে ফেরত নিয়ে যাওয়ার স্বাধীনতা

২৫,০০০ ইউএস ডলার/ ইউরো ডিপোজিট করলে স্পেশাল অফার

১৫০০+ আন্তর্জাতিক লাউঞ্জে প্রবেশ ও 'লাউঞ্জ key' সুবিধা
হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে মিট অ্যান্ড গ্রিট
এবং পিক অ্যান্ড ড্রপ সার্ভিস

*শর্ত প্রযোজ্য

16474
+8809678016474
For ISD/Overseas Call
www.dhakabankltd.com

বিস্তারিত জানতে এবং অ্যাকাউন্ট ডিজিট করুন
www.dhakabankltd.com/obu

ঢাকা ব্যাংক পিএলসি

EICHER
নতুন সময়ের নতুন ভাবনা

পণ্য পরিবহণে একধাপ এগিয়ে

শুরু থেকেই ব্যবসার জন্য প্রস্তুত,
সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য আইশার ট্রাক

আইশার প্রো ১০৭৫ ১৪ ফিট কার্গো বডি
আইশার প্রো ৩০১৫ ২৪ ফিট কাভার্ড ভ্যান
আইশার প্রো ১০৯৫ ১৬ ফিট কার্গো বডি

শক্তিশালী ইঞ্জিন | জ্বালানি সাশ্রয়ী | অধিক মাইলেজ

RUNNER motors limited

হটলাইন ০১৭৩০৮০৬৮৮৪

www.runnerbd.com

ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলা শহরের মোড়াইলে খ্রিষ্টীয় ব্যাপ্টিষ্ট চার্চের প্রাচীরে আঁকা দেয়ালচিত্র

গণতন্ত্র নির্মাণ করতে চাই নিয়ন্ত্রিত গণতন্ত্র নয়

মাহমুদুর রহমান মান্না

প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী আয়োজন

গায়ের জোরে কিংবা বলপ্রয়োগ করে ক্ষমতায় থাকা যায় না। রাজনীতিও হয় না। আওয়ামী লীগ সরকার তা পারেনি। জনসাধারণের সঙ্গে না থাকলে, জনগণের রায়ের সঙ্গে আপস না করে, উপরন্তু বলপ্রয়োগ করে, দখলবাজি ও চাঁদাবাজি করে চিরদিন ক্ষমতাকে কুক্ষিগত করে রাখা যায় না। এটাই জুলাই গণঅভ্যুত্থানের শিক্ষা। জুলাই গণঅভ্যুত্থান একটা অসম্ভবকে সম্ভব করেছে। বাংলাদেশের সাধারণ শিক্ষার্থীদের সঙ্গে ঐক্যবদ্ধ হয়ে দেশের মানুষ প্রাণ বিসর্জনের মতো একটা উদাহরণ সৃষ্টি করতে পেরেছে। এর ফলে মানুষের মধ্যে চেতনা এসেছে। বিশেষ করে অন্তর্বর্তী সরকারকে দেখে তারা বিশ্বাস করতে পারছেন, তারা যে পরিবর্তনের আশা করছেন, তার একটা সূচনা সম্ভবত হয়েছে। আর যারা আন্দোলন করেছেন, তারা একটা নতুন বাংলাদেশ গড়তে চান। বারবার তারা স্পষ্ট করে এটাই বলেছেন। অন্তর্বর্তী সরকার খুব জটিল পরিস্থিতিতে দায়িত্ব নিয়েছে। এ কারণে এই কয়েক মাসে সরকারকে যেসব জটিল পরিস্থিতির মুখোমুখি হতে হয়েছে, সেটা হয়তো তাদের নিজেদের ভাবনায় ছিল না। আর গণঅভ্যুত্থান-পরবর্তী দেশের অর্থনীতি, রাজনীতি কোনো কিছুরই বৈপ্লবিক পরিবর্তন সম্ভব হয়নি। সুতরাং জুলাই অভ্যুত্থানকে বিপ্লব বলা যায় না। এখন অনেকে বলছে, এখানে কিছু ভুল ছিল। কেউ বলছে একটা বিপ্লবী সরকার গঠন করা উচিত ছিল। এতে সন্দেহ নেই যে, মানুষ ঐক্যবদ্ধ হয়ে একটা কঠিন লড়াই করেছে, সেখানে বিপ্লবী চেতনা ছিল বলেই সম্ভব হয়েছিল।

আমার বিবেচনায় জুলাইয়ের পুরো আন্দোলন ছিল স্বতঃস্ফূর্ত, সেটা খুব সংগঠিতও ছিল না। সাধারণভাবে দেশ বদলানোর একটা লক্ষ্য থাকলেও এটাকে লক্ষ্যাভিমুখী আন্দোলন বলা যাবে না। মানুষ ঐক্যবদ্ধ হয়ে একটা কঠিন লড়াই করেছে এবং সেখানে বিপ্লবী চেতনা ছিল।

অন্তর্বর্তী সরকারের রাষ্ট্র সংস্কারের জন্য আগস্ট থেকে এ পর্যন্ত সময়টা অনেক কম। এত কম সময়ের মধ্যে সরকারের কার্যক্রম মূল্যায়ন করাটা যুক্তিসংগত হবে না। সংস্কার একটা বিরাট বিষয়। কেননা, পুরো দেশটাই বদলাতে হবে। নতুন দেশ তৈরি করতে হবে। নতুন ও ভিন্ন ধরনের বাংলাদেশে গণতন্ত্র থাকবে, মানবিক মূল্যবোধ থাকবে। কল্যাণধর্মী রাষ্ট্র করার প্রতিশ্রুতি থাকবে। পাশাপাশি দেশ কীভাবে টেকসই অর্থনীতির রাষ্ট্র হবে সে বিষয়গুলো ভাবতে হবে। আমাদের দেশে বারবার ফ্যাসিবাদ ফিরে আসছে, কারণ আমাদের সংবিধানে এমন কিছু বিষয় আছে যা ফ্যাসিবাদকে সাপোর্ট করে। প্রধানমন্ত্রীর অপরিসীম স্বাধীনতা, কোনো জবাবদিহিতা নেই, বিচার বিভাগের স্বাধীনতা নেই, জনগণের বলবার জায়গা নেই– এগুলো ছিল। তা ঢেলে সাজাতে হবে। সংবিধান পরিবর্তন, দেশের সংস্কারের জন্য ঐকমত্য লাগবে। ভাবের দিক থেকে, চিন্তার দিক থেকে, কাজের দিক থেকে, দলের দিক থেকে এমনিতেই বাংলাদেশ অনেক বিভাজিত। এই বিভাজন যদি চলতে থাকে, তাহলে এগিয়ে যাওয়া যাবে না। আমাদের মতগুলো এক করতে হবে। এমন একটি নির্বাচন করতে হবে, যেখানে সবাই আনন্দের সঙ্গে অংশগ্রহণ করতে পারবেন। শেখ হাসিনা এ দেশের গণতন্ত্র ও নির্বাচন ধ্বংস করে দিয়েছেন। তাই নির্বাচন দেওয়া এবং ভোটাধিকার ফিরিয়ে আনা খুব জরুরি। তবে রাষ্ট্র সংস্কার করে নির্বাচন দিতে হবে। পুলিশকে ঢেলে সাজাতে হবে। পুলিশকে জনবান্ধব করে তুলতে হবে। সাবেক প্রধানমন্ত্রীর সময়ে পুলিশ যেভাবে অত্যাচার করেছে, যেভাবে গুলি ছুড়েছে, তা অবর্ণনীয়। এই সরকার দায়িত্ব নেওয়ার পর পুলিশ কোনো কাজই করছে না। তারা নিষ্ক্রিয়। পুলিশ ও আইনব্যবস্থা সক্রিয় না হলে নির্বাচন করা সম্ভব না। তাই পুলিশকে সংস্কার করেই সুষ্ঠু নির্বাচন দিতে হবে। বাংলাদেশকে আবার যারা পেছনে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করবে, তাদের রুখে দিতে হবে।

সংস্কার চলমান প্রক্রিয়া। কেউ বলতে পারবে না দেশের সবকিছু পরিপূর্ণভাবে ভালো হয়ে গেছে, আর সংস্কারের দরকার নেই। তাই সংস্কার থামিয়ে দিলাম। সংস্কারের জন্য আজীবনই একজন সরকার থাকা লাগবে। এজন্য তাকে ঠিক করে দিতে হবে 'তুমি এতদূর করো'। আমরা এতটুকু বুঝি নির্বাচন যেন সুষ্ঠু হয়, গ্রহণযোগ্য হয়, সন্তোষজনক হয়, তার জন্য যে সমতল ভূমি তৈরি করার দরকার তা করে তারা যাবেন। দুই মেয়াদের বেশি প্রধানমন্ত্রী থাকা যাবে না, ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণের কথাও কেউ কেউ বলছেন। এ পর্যন্ত আপনি মোটামুটিভাবে মেনে নিতে পারেন। এর পরই নির্বাচনে যাওয়া যাবে। পরে নির্বাচিত সরকার এসে বাকি সংস্কার করবে।

সংস্কারের কথা বলতে গেলে বলতে হয় বাজারে জিনিসপত্রের দাম কমেনি। এখন তো সিন্ডিকেট নেই। সমন্বয়কেরাও এখন সরকারকে দ্রব্যমূল্য নিয়ে প্রশ্ন করছে। সাধারণ মানুষ প্রশ্ন করছে– 'এখনও কেন দাম কমছে না?' সরকারকে এগুলো নিয়েও ভাবতে হবে। মানুষের পেটে আগুন লাগলে, সংস্কার ভালো লাগে না। এই সরকারকে প্রথমে পেটের ক্ষুধা দূর করতে হবে, দ্রব্যমূল্য কমাতে হবে। গণঅভ্যুত্থান ও বিপ্লবের পর কোনোভাবে এই সরকার যদি ব্যর্থ হয়, তাহলে দেশ ব্যর্থ হবে। সরকারকে চোখ কান খোলা রাখতে হবে। বিভিন্ন সহিংস ঘটনা, অপতৎপরতা উদ্বেগের বিষয়। আমি মনে করি এগুলো এক ধরনের সতর্ক বার্তাও দেয়। সম্প্রতি আইনজীবী যিনি মারা গেছেন, তাকে কুপিয়ে হত্যা করা হয়েছে। এটা হিংসার চূড়ান্ত জায়গা থেকেই করা হয়েছে। এরকম ঘটনা আমরা আমাদের দেশে কম দেখি, আশপাশে দেখি। যেন রেপ্লিকার মতো এ ঘটনা ঘটেছে। এই ঘটনা যখন শুরু হয়েছে তখন আমাদের প্রতিবেশি রাষ্ট্র থেকে তাদের শাসক দল, তাদের মুখপাত্ররা বিভিন্ন বিবৃতি দিয়েছেন। রাজনৈতিক দলগুলোর কাছে আমরা আরও স্পষ্ট ভূমিকা চাই। যারা স্বৈরাচার বিরোধী আন্দোলন করেছে, যারা এদেশে সত্যি সত্যি গণতন্ত্রের চর্চা করতে চান এবং তা অব্যাহত রাখতে চান তাদেরকে এই অপতৎপরতা রুখে দিতে হবে। মিডিয়ার ওপর যেভাবে আঘাত আসে তা মানা যায় না। পত্রিকা অফিসের সামনে গরু জবাইয়ের মতো যে বিভৎস কাণ্ড ঘটলো তা ধিক্কারজনক। আমরা পূর্ণ স্বাধীনতার কথা বলি। কারণ আমরা গণতন্ত্র নির্মাণ করতে যাচ্ছি। সেটা নিয়ন্ত্রিত গণতন্ত্র কোনোভাবেই না। আপনার কোনোকিছু যদি পছন্দ না হয়, সেটা বলবার ধরন আছে। অস্ত্রের ভাষায়, জিঘাংসার ভাষায় বলা কোনোভাবেই গ্রহণযোগ্য হতে পারে না। বিভিন্ন বিষয় নিয়ে সরকারকে সতর্ক থাকতে হবে। ঘটনা ঘটে যাওয়ার পরে সরকার কাজ শুরু করবেন তা চাই না। আগে থেকে প্রোঅ্যাকটিভ থাকতে হবে। বিভিন্ন সহিংসতা প্রতিরোধে সরকার ও সরকারের আইন শৃঙ্খলা বাহিনী এখন পর্যন্ত প্রোঅ্যাকটিভ তো নয়ই, অ্যাকটিভও নয়। এক্ষেত্রে সরকারকে আরও বেশি সতর্ক থাকতে হবে।

সংস্কারের ব্যাপারে আমাদের একটা সম্মিলিত অবস্থান ছিল। আমরা ৪১ থেকে ৪২টি দল বিগত সরকারের আমলে যে যুগপৎ আন্দোলন করছিলাম, সেখানে ৩১ দফা প্রস্তাব দিয়েছিলাম। প্রাথমিকভাবে মনে হচ্ছে, অন্তর্বর্তী সরকার দৃষ্টিভঙ্গিগতভাবে আমাদের সংস্কারের দৃষ্টিভঙ্গির বিরোধী নয়। কিন্তু দেশে একটা বিরাট পরিবর্তন হয়েছে। ফলে পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে আমরা আমাদের সংস্কারভাবনাগুলো আপডেট করে যেভাবে বলতে হয়, সেটা বলার চেষ্টা করছি। আগে মনে হয়েছিল, সংস্কারের সব বিষয়ে রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে একটা নিষ্পত্তি হয়েছে। কিন্তু এখন কিছু কিছু ক্ষেত্র, যেমন সংখ্যানুপাতিক ভোটসহ কিছু বিষয়ে আমাদের দৃষ্টিভঙ্গির পার্থক্য সামনে আসছে। আমি, আমার দল ও জোট আমরা সংখ্যানুপাতিক ভোটের পক্ষে পড়েছি। আমরা ছয়টা দলসহ আরও ৪১ টি দলের প্রেক্ষিতে কয়েকটি প্রশ্ন তৈরি হয়েছে যে প্রশ্নগুলো বিবেচনায় নেওয়া যেতে পারে। নির্বাচন কোন পদ্ধতিতে হবে এটার কোনো ইন্টারন্যাশনাল স্ট্যান্ডার্ড নাই। একেক দেশে একেক রকমভাবে করতে পারে। নির্দিষ্ট ক্যানডিডেট বা প্রার্থী থাকবে না। আমি আমার এলাকায় যখন দাঁড়াব তখন নিজের পরিচিতি, গুণাবলি দিয়ে ইম্প্রেস করতে পারি। কিন্তু এখানে এরকম ইনডিভিজুয়াল ক্যাপাসিটিতে ইমপ্রেস করার জায়গা নেই। এখানে একটা তালিকা থাকবে। কোনোকিছুই গোপন থাকবে না। একটা দল যত পার্সেন্ট ভোট পাবে সে অনুসারে ১-২-৩-৪ এমন ক্রমধারা থাকবে। যিনি এক নম্বর হবেন তিনি এক নম্বর সিটেই থাকবেন। চার নম্বরকে ৫ নম্বরে নিয়ে গেলে এখানে বাণিজ্য করার সুবিধা হবে।

এখানে মিনিমাম পারসেন্টেজ ভোট পাওয়ার কথা থাকে। কোথাও ১ শতাংশ, কোথাও ৫ শতাংশ এর কথা বলা হয়েছে। পাকিস্তান আমল থেকে এ পর্যন্ত যেসব রাজনৈতিক দল এ পদ্ধতিতে নির্বাচিত হয়েছেন, তাদের প্রাপ্ত ভোট যদি দেখেন তা খুব হতাশাজনক। কেউ হয়তো খেয়াল করেন নাই। যদি করতেন তাহলে হতাশ হতেন। আরেকটি বিষয় হলো সংখ্যানুপাতিক ভোট। এটা ভালো বিষয়। এর জন্য ব্যাপক বোঝাপড়ার দরকার। কেন? এখন যে ভোট হবে কোনো একটা দল সংখ্যাগরিষ্ঠ হয়ে সরকার গঠন করতে পারবে। আমাদের দেশে আওয়ামীলীগ ও বিএনপি- দুটো বড় রাজনৈতিক দল ছিল। তাদের এভারেজ ভোট ছিল ৩০-৩৫-৩৬ শতাংশ এর মধ্যে। কিন্তু আগের সিষ্টেমে ৩৬ শতাংশ ভোটও যদি পান তাহলে এখনকার সিষ্টেমে ১৫০ এর বেশি সিট পেয়ে যাবেন। ৩৫ শতাংশ মানে ৩ দিয়ে পূরণ করেন ৩৫কে, তাহলে ১০৫টি সিট পেয়েছেন। আপনি তো সরকার গঠন করতে পারবেন না। তখন কারো সঙ্গে কোয়ালিশন করতে হবে। কোয়ালিশনের জন্য বড় ধরনের বোঝাপড়া দরকার। কোয়ালিশন সরকার টিকবে কিনা সেটাও প্রশ্ন। এর জন্য অনেকগুলো ফর্মও আছে। আমরা সব বিষয়গুলো নিয়ে আলোপান্ত ভেবে এখনো কথা বলি নাই। আমাদের নিজেদের মধ্যে যে আলোচনা, মত আদান প্রদানের দরকার, নিজেদের জ্ঞান সমৃদ্ধ করা দরকার তাও করা হয়নি। আমরা বিষয়গুলো নিয়ে ভাবছি। এই মুহূর্তে রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে শক্তির যে ভারসাম্য আছে তাতে এই ভোটে ইমব্যালেন্স তৈরি হবে। হয়তো অনেকের উত্থান হবে, যাদের আমরা গুরুত্ব দিয়ে ভাবছি না। তবে আশা রাখি, গণতন্ত্রের পথে দেশ দৃঢ়ভাবে এগিয়ে যাবে। ❖

সভাপতি
নাগরিক ঐক্য

'গণতন্ত্রের পথে যাত্রা কখনোই মসৃণ হয় না'

▶ ২ পৃষ্ঠার পর

এবার ২০২৪-এর জুলাই-আগস্টের আন্দোলন সফল হয়েছে। তার আগে ছাত্ররা কয়েকটি আন্দোলন করেছে। ২০১৮ সালে তারা কোটা সংস্কার ও নিরাপদ সড়কের দাবিতে আন্দোলন করেছে। সেগুলো সরকার দমন করে দিতে পেরেছিল। রাজনৈতিক দলগুলো, বিশেষত বিএনপি সরকার পতনের একলক্ষ্য আন্দোলন বেশ কয়েক বছর ধরেই করছিল। বিগত সরকার অগণতান্ত্রিকভাবে তিনটা জাতীয় নির্বাচন করেছে। বহু বছর ধরে মানুষের মধ্যে ক্ষোভ জমছিল। তারই পরিপ্রেক্ষিতে শেষ পর্যন্ত জুলাইয়ের ছাত্র আন্দোলন খুব দ্রুত জনগণের ব্যাপক সমর্থন পেয়েছিল। কোনো আন্দোলনই মাত্র একবার করেই তা সফল হয় না। তার পেছনে অনেক আন্দোলন-সংগ্রাম থাকে, যা হয়তো সফল হয়নি।

এবারের আন্দোলন প্রধানত ছাত্ররাই করেছে। খুব অল্প সময়, মাত্র ৩৬ দিনের মধ্যে সরকারের পতন হয়েছে। এই আন্দোলনে কিছু ভিন্নতা দেখা গেছে। এবারের আন্দোলনে যত রক্তক্ষরণ হয়েছে, হতাহত হয়েছে; এর আগে এত বিশাল আকারে হতাহতের ঘটনা দেখা যায়নি। এর আগে যেসব আন্দোলন হয়েছে, সেখানে রাজনৈতিক দলগুলোর ভূমিকা বেশ দৃশ্যমান ছিল। সেটি এবার সেভাবে দৃশ্যমান ছিল না। রাজনৈতিক দলের কর্মীরা আন্দোলনে অংশগ্রহণ করেছিলেন; কিন্তু আন্দোলনের সময় সেভাবে প্রকাশ করা হয়নি। এবারের আন্দোলনের আরেকটা ভিন্নতা হলো– ছাত্ররা প্রচলিত রাজনৈতিক দলগুলোর বাইরে নিজেদের একটা স্বতন্ত্র পরিচিতির প্রকাশ ঘটিয়েছে 'বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলন' নামে। আন্দোলনের পরও তারা নিজেদের স্বাতন্ত্র্য বজায় রাখার চেষ্টা করে চলেছে। এসবের ফলে এবার আন্দোলন শেষ হওয়ার অল্প সময়ের মধ্যে আন্দোলনে কার কী ভূমিকা ছিল, কার জন্য এ আন্দোলন সফল হয়েছে, তা নিয়ে একটা বিতর্কের সৃষ্টি হয়েছে। এর আগে আন্দোলন শেষ হওয়ার অল্প সময়ের পরই যারা মিলে একটা আন্দোলন করেছে, তাদের মধ্যে এমন বিভাজন দেখা যায়নি।

● দেশের প্রচলিত রাজনৈতিক দলগুলোর প্রতি কি জনগণের আস্থার অভাব দেখা দিয়েছে?

●● রাজনৈতিক দলগুলো নিয়ে জনসাধারণের মধ্যে হয়তো এখন খুব ভালো ধারণা রয়েছে, এমন নয়। তারা দেশের দুই বড় দল আওয়ামী লীগ ও বিএনপিকে কয়েকবার ক্ষমতায় থাকতে দেখেছে। জনগণ জানে, কোনো দল যখন ক্ষমতায় আসে, তখন তারা সহজে ক্ষমতা ছাড়তে চায় না। তারা হয়তো নির্বাচন নিয়ে নানা কারচুপি করে। ক্ষমতাসীনদের সমর্থকরা বিভিন্ন এলাকায় অনেক বেশি প্রভাবশালী হয়ে যান। চাঁদাবাজিসহ তারা বিভিন্ন দুর্নীতির সঙ্গে যুক্ত হয়ে পড়েন। রাজনীতির দুর্বৃত্তায়ন এবং অর্থনীতির লুটপাট যে হয়, সেটি জনগণ ভালোই জানে। তবে রাজনৈতিক দলগুলো সম্পর্কে খুব ভালো ধারণা না হলেও জনগণ এটাও জানে যে, শেষ পর্যন্ত নির্বাচিত রাজনৈতিক দল দিয়েই দেশ পরিচালনা করতে হবে। সাধারণ মানুষের সঙ্গে কথা হলেই আমি যে কথা শুনি, তা হলো– 'আপা, আপনি অনেক লেখাপড়া জানেন। আপনি অনেক ভালো মানুষ। কিন্তু আপনাদের মতো ভালো মানুষ, বা এত লেখাপড়া জানা লোক এ দেশে রাজনীতি করতে পারবে না। রাজনীতি করতে হলে রাজনীতিবিদদেরই দরকার হবে।' যেহেতু আমি এ বিষয়ে গবেষণা করিনি, তাই এ কথা বলতে পারব না যে, সব রাজনৈতিক দলের প্রতি জনগণের অনাস্থা তৈরি হয়েছে কিনা। আমার ধারণা, জনগণকে জিজ্ঞেস করলে তারা হয়তো এখনও একটা নির্বাচনের কথা বলবে; যেখানে রাজনৈতিক দলগুলোই অংশগ্রহণ করবে।

● সংবিধান সংশোধন, পুনর্লিখন নিয়ে বিভিন্ন মহলে আলোচনা-বিতর্ক চলছে। এ বিষয়ে আপনার মতামত কী?

●● আমার মতে, এখনই সংবিধান সংশোধন, পুনর্লিখন বা নতুন করে প্রণয়নের বিতর্ক আরম্ভ করার দরকার নেই। আমাদের আগে জানতে হবে, আলোচনা করতে হবে, আমরা সংবিধানের কী কী সংশোধন চাই এবং কেন চাই। এসব বিষয়ে প্রচুর আলোচনা করতে হবে। এরপর দেখতে হবে, কোন কোন পরিবর্তনের বিষয়ে ঐকমত্য আছে বা নেই। তারপরই হয়তো আমরা এ আলোচনায় যেতে পারি যে, সংবিধানের সংশোধন করলেই চলবে কিনা। সংবিধান রাষ্ট্রের একটি মৌলিক দলিল। জাতীয় ঐকমত্য ছাড়া এর পরিবর্তন করা যুক্তিসংগত নয়। বর্তমান পরিস্থিতিতে সত্যিকারের জাতীয় ঐকমত্য প্রতিষ্ঠা করা দুরূহ। এ ছাড়াও সংবিধান সংশোধনের একটি সাংবিধানিক প্রক্রিয়া আছে; যা আমাদের মেনে চলতে হবে।

● বিদ্যমান ব্যবস্থায় রাজনৈতিক দুর্বৃত্তায়ন ও অর্থনৈতিক লুটপাট থেকে মুক্তির উপায় কী?

●● রাজনীতিতে দুর্বৃত্তায়ন ও অর্থনীতিতে লুটপাট পরস্পর সম্পর্কযুক্ত। এর থেকে খুব সহজে বের হওয়ার তেমন কোনো উপায় নেই। আমাদের দেশে দলগুলো এবং নির্বাচনে অর্থায়ন অনেকটা শক্তিশালী গোষ্ঠী বা ব্যক্তির মাধ্যমে হয়ে থাকে, যারা রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত এবং রাজনীতির কাছাকাছি থাকাতেই হয়তো তারা অর্থনৈতিক লুটপাটের সঙ্গে যুক্ত। যদি আমরা রাজনৈতিক দলের অর্থায়নে স্বচ্ছতা নিশ্চিত করতে পারি বা নির্বাচনে বিপুল অর্থের ব্যবহার কমিয়ে আনা যায়; তাহলে রাজনীতিতে দুর্বৃত্তায়ন ও অর্থনীতিতে লুটপাট অনেকটা নিয়ন্ত্রণে আনতে পারব। এজন্য দরকার হবে একসঙ্গে সব রাজনৈতিক দলের অঙ্গীকার। আমাদের দেশে রাজনীতি, অর্থনীতিসহ সব ব্যাপারে আমরা যে সংস্কার চাচ্ছি, তার কোনোটাই সম্ভব হবে না, যদি না আমরা এসব ব্যাপারে একটি রাজনৈতিক ঐকমত্য গড়ে তুলতে পারি।

● অন্তর্বর্তী সরকারের প্রথম তিন মাসকে কীভাবে মূল্যায়ন করবেন?

●● অন্তর্বর্তী সরকারের তিন মাস হয়েছে। তা খুব বড় সময় নয়। দায়িত্বে এসে এ সরকার একটা ভঙ্গুর অর্থনীতি পেয়েছে। রাষ্ট্র কাঠামো, আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীও একটা ভঙ্গুর অবস্থায় ছিল। অতএব তাদের একটা বিরাট চ্যালেঞ্জের মধ্য দিয়ে যেতে হয়েছে। দেশ চালানো, সরকারের নিয়মিত কাজ চালিয়ে যেতে হয়েছে। সেই সঙ্গে দেশের মানুষের আকাঙ্ক্ষা সামনে রেখে তারা বেশ কিছু সংস্কারের কাজও হাতে নিয়েছে। তারা কোনো বৃহৎ দলের সমর্থন নিয়ে ক্ষমতায় আসেনি। সব মিলিয়ে বিরাট চ্যালেঞ্জ নিয়ে তাদের কাজ করতে হয়েছে। আমি বলব, তাদের প্রচেষ্টার কোনো ঘাটতি নেই।

● অন্তর্বর্তী সরকারের কাছে বিএনপি রোডম্যাপ (রূপরেখা) ও দ্রুত নির্বাচন দেওয়ার দাবি জানিয়েছে। বিষয়টি কীভাবে দেখছেন?

●● বিএনপি যে রোডম্যাপ (রূপরেখা) ও দ্রুত নির্বাচনের দাবি জানাবে, এটিই স্বাভাবিক। আওয়ামী লীগ যেহেতু মাঠে নেই; তারাই এখন দেশের সবচেয়ে বড় দল। তারা বহু বছর ধরে, ২০০৮ সালের নির্বাচনের পর কোনো সুষ্ঠু নির্বাচনে অংশ নিতে পারেনি। একটি প্রতিযোগিতামূলক, অংশগ্রহণমূলক নির্বাচনের জন্য সংগ্রাম করে চলেছে। নির্বাচনের বাইরে থেকে দলকে সংগঠিত রাখা একটি দুরূহ কাজ, যা তারা এতদিন করেছে। অতএব তারা যে একটি রূপরেখা চাইবে এবং দ্রুত নির্বাচনের দাবি জানাবে, এমনটাই হওয়ার কথা।

● নির্বাচনের আগে প্রয়োজনীয় সংস্কারের কথা জানিয়েছেন প্রধান উপদেষ্টা। এ ক্ষেত্রে কোন বিষয়গুলো অগ্রাধিকার দেওয়া দরকার বলে মনে করেন?

●● একটি সুষ্ঠু নির্বাচনের জন্য এবং যে দলই নির্বাচিত হয়ে ক্ষমতায় আসুক না কেন, তারা যেন জবাবদিহির বাইরে না যেতে পারে; তার জন্য প্রশাসন, বিচার ব্যবস্থা ও পুলিশের কিছু সংস্কার আনতে হবে। ভবিষ্যতে কোনো সরকার যেন দলীয়করণ না করতে পারে সেই ধরনের সংস্কারগুলো অগ্রাধিকার দেওয়া উচিত। সেই সঙ্গে অর্থনীতির ক্ষেত্রে যেসব সংস্কারের কথা বলা হচ্ছে ব্যাংকিং ও ফিন্যান্সিয়াল খাতে, যা আমাদের অর্থনীতিকে দুর্বল করে দিয়েছে; এগুলোকে অগ্রাধিকার দেওয়া দরকার।

● আমাদের গণতান্ত্রিক চর্চার সংকটগুলো কী কী?

●● বিভিন্ন রাজনৈতিক দল বা নাগরিক সমাজেও আমি দেখেছি, গণতান্ত্রিক চর্চায় যে ধরনের সহিষ্ণুতার দরকার হয়, ভিন্নমত প্রকাশের স্বাধীনতার দরকার হয়, আমাদের মধ্যে তার অভাব রয়েছে। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমের জন্য এখন আরও বেশি প্রকট হচ্ছে। যে কেউ যা কারও সম্পর্কে একটা অভিমত প্রকাশ করে ফেলতে পারেন এবং যে কাউকে একটা তকমা লাগিয়ে দেওয়ার চর্চা দেখা যাচ্ছে। এগুলো বহুমত চর্চার ক্ষেত্রে একটা বড় সংকট সৃষ্টি করছে।

● দেশের গণতন্ত্রের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে আপনার মতামত জানতে চাই।

●● আমরা বারবার গণতন্ত্রের যাত্রায় হোঁচট খাচ্ছি। ভবিষ্যতেও এ যাত্রা খুব মসৃণ হবে না। সবাইকে অনেক ধৈর্য দেখাতে হবে; ভিন্নমতের প্রতি শ্রদ্ধা দেখাতে হবে। গণতন্ত্র মানেই বহুমতের সমাবেশ। কোনো ভিন্নমতকে বের করে দেওয়া নয়। একদিক থেকে হয়তো বলি, আমরা 'ইনক্লুসিভ' বা অন্তর্ভুক্তিমূলক। কিন্তু আজকাল 'ক্যানসেল কালচার'ও দেখা যাচ্ছে। আবার আমাদের দেশে রাজনৈতিক সহিংসতাও আছে বহু বছর ধরে। অথচ গণতন্ত্র মানেই শান্তিপূর্ণভাবে রাজনৈতিক এবং রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার হস্তান্তর ঘটানো। অতএব শান্তিপূর্ণভাবে এবং পরস্পরের ভিন্নমতের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে ধৈর্যের সঙ্গে ভবিষ্যতের রূপরেখায় পথচলাই আমাদের জন্য এক বিরাট চ্যালেঞ্জ।

● সমকালকে সময় দেওয়ার জন্য আপনাকে ধন্যবাদ।

●● আপনাকেও ধন্যবাদ। ❖

বুর্জোয়াদের রাজনীতিতে মানুষের আস্থা নেই

▶ ২ পৃষ্ঠার পর

প্রথমটির পরিণতি ফ্যাসিবাদে; দ্বিতীয়টি সৃষ্টি চায় সামাজিক বিপ্লবের। ত্রাণকে সামনে আনতে হলে দুর্যোগের জন্য অপেক্ষা অপ্রয়োজনীয়, কারণ দুর্যোগ এখন সার্বক্ষণিক, দুর্যোগ থেকে মানুষের মনুষ্যত্বকে রক্ষা করার জন্য প্রয়োজন পুঁজিবাদী ব্যবস্থার পীড়ন থেকে পরিত্রাণ।

রোগ সমাজের গভীরে, এবং রক্তে রক্তে। সংস্কারে কুলাবে বলে আশা করাটা যে বর্তমানে নিতান্তই ভ্রান্তিবিলাস, সেটা যেন না ভুলি। সমাজ পরিবর্তনের আন্দোলনকে গুটিয়ে ফেলার কোনো অবকাশ নেই। সেটা সম্বিতে সার্বক্ষণিকভাবেই থাকা আবশ্যক। মানুষ কাজ চায়, কেবল জীবিকার নয়, মানুষ জীবনের কাজও করতে প্রস্তুত; জীবনের কাজটা সমাজ বদলের। অভাব যার সেটি হলো আন্দোলন। ওই আন্দোলন বুর্জোয়ারা করবেন না, বুর্জোয়ারা বৈষম্যবিরোধী নন, তারা বৈষম্য সৃষ্টি ও লালনপালনের পক্ষে; আন্দোলন করতে হবে বৈষম্যবিরোধীদের, অর্থাৎ সমাজতন্ত্রীদের। সমাজতন্ত্রীরা যদি একটি সুনির্দিষ্ট ও অতীব প্রয়োজনীয় কর্মসূচি নিয়ে যুক্তফ্রন্ট গঠন করেন, তবে দেখা যাবে সেই ফ্রন্টে মানুষ কীভাবে সাড়া দিচ্ছেন, এবং অসম্ভবকে সম্ভব করার দিকে অগ্রসর হচ্ছেন। ১৯৫৪-এর নির্বাচনে পাঁচমিশালি একটি যুক্তফ্রন্ট গঠিত হয়েছিল, তাতে মুসলিম লীগের পতন ভিন্ন অন্য কিছু অর্জিত হয়নি; এখন আর পাঁচমিশালি না, প্রয়োজন সমাজতন্ত্রীদের যুক্তফ্রন্ট। শিক্ষার্থীদের কোটাবিরোধী আন্দোলনের সাফল্য সামাজিক বৈষম্য দূর করবে না। প্রয়োজন মিলিত হয়ে সমাজের বৈপ্লবিক পরিবর্তন সম্ভব করে তুলবার পথে এগোনো। এই যুক্তফ্রন্ট জাতীয় নির্বাচনে অংশ নেবে; ওই পথে সামাজিক বিপ্লব ঘটবে এই আশা নিয়ে নয়, সমাজবিপ্লবের পক্ষে জাতীয় সংসদের ভেতরে এবং বাইরে জনমত ও জনসচেতনতা সৃষ্টির জন্য। নির্বাচনের আগে দাবি হওয়া চাই প্রাপ্ত ভোটের সংখ্যানুপাতে আসন বণ্টনের; এবং নির্বাচিত জাতীয় সংসদকে রাষ্ট্রীয় সংবিধানে প্রগতিশীল ও গণতান্ত্রিক উপাদান যুক্ত করবার অধিকার দানের। রাষ্ট্রীয়ভাবে এই ঘোষণাটাও থাকা চাই যে বাহাত্তরের সংবিধানে গণতান্ত্রিক সমাজ ও রাষ্ট্র গঠনের যে অঙ্গীকার ব্যক্ত ছিল, তা কোনোমতেই অমান্য করবে না।

সমাজ পরিবর্তনকারীদের ঐক্যটা হবে সামাজিক বাস্তবতার পরিবর্তনের লক্ষ্যে। এবং ঐক্য যতটা না নেতাদের হবে তার চেয়ে বেশি হবে কর্মীদের। দেশের মানুষ ওই ঐক্যের জন্য অপেক্ষমাণ। বুর্জোয়াদের রাজনীতিতে তাদের আস্থা শেষ হয়ে গেছে। শেষ হয়ে গেছে বর্তমান সরকারের ওপর আস্থা-ভরসাও।

ইমেরিটাস অধ্যাপক
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

concito

আপনার গল্প বলুন আমাদের হাত ধরে

concitolive concitolive concitolive www.concito.co

bibiyana - the largest producing gas field in Bangladesh

Chevron Bangladesh's bibiyana gas field in Nabiganj, Habiganj district, is Bangladesh's largest producing gas field. It was discovered in 1998 and started its production in 2007. Currently the field has 27 gas producing wells and supplies about 40% of total domestic gas production in Bangladesh.

the human energy company Chevron

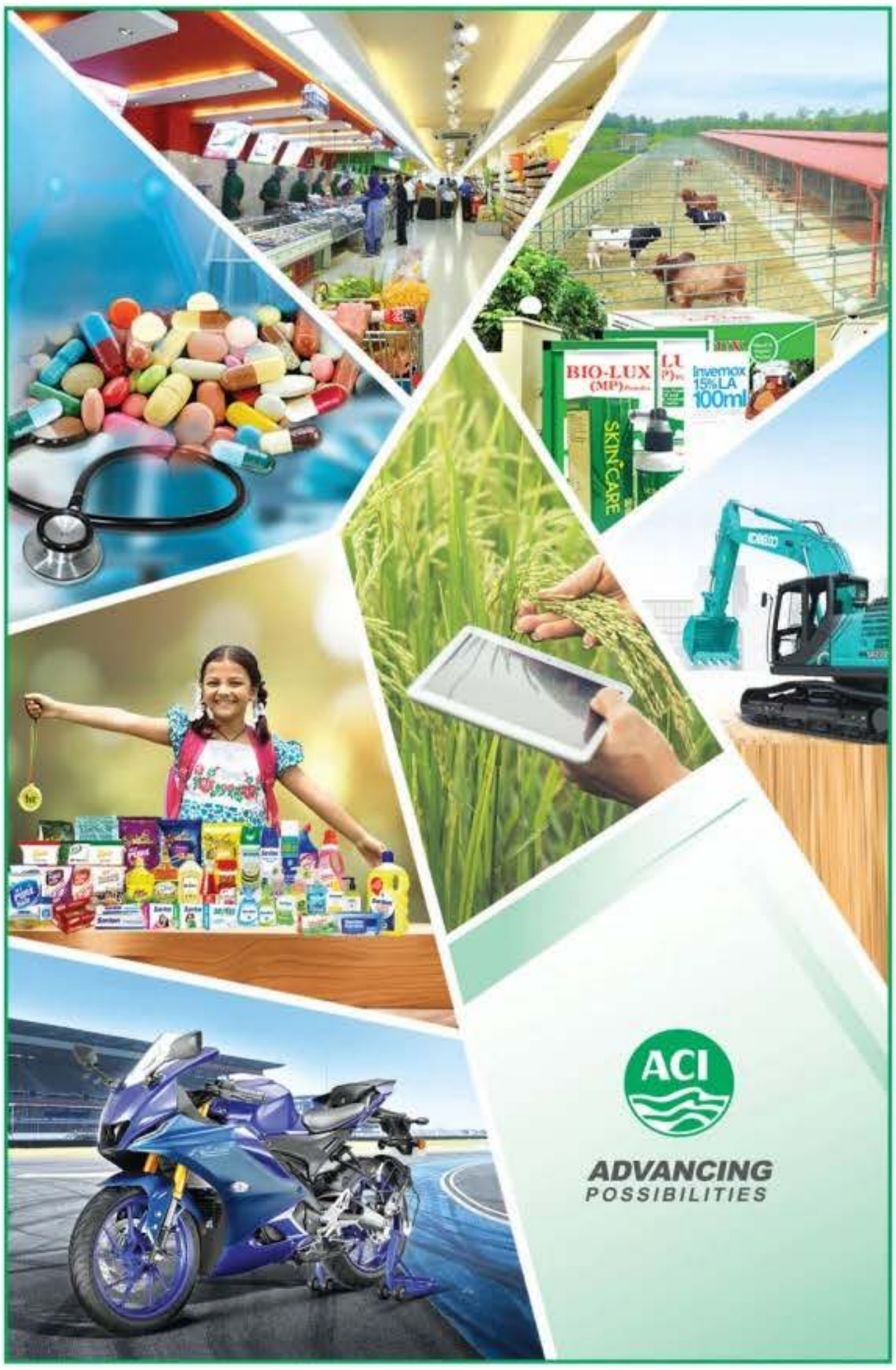

কি দারুন স্বাদে ভরা.....

বনফুল

লাচ্ছা সেমাই

বছরে
সমকাল
মুক্তপ্রাণ। মুক্তধারা
দেশের বহুল প্রচারিত জনপ্রিয় দৈনিক
সমকালের ১৯তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকীতে
শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন
সমকাল
সমকাল সুহৃদ সমাবেশ

গৌরবময় ২০ বছর পূর্তিতে সমকালকে আন্তরিক শুভেচ্ছা!

এনআরবিসি ব্যাংক সিকিউরিটিজ লিমিটেডের পক্ষ থেকে, আমরা দৈনিক সমকাল পত্রিকার বিংশ প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষে সকল সাংবাদিক এবং প্রকাশনার সাথে জড়িত সকলকে আন্তরিক অভিনন্দন ও শুভেচ্ছা জানাই। দৈনিক সমকাল বাংলাদেশের পাঠকদের মধ্যে একটি লালিত স্থান অর্জন করেছে, মূলত বস্তুনিষ্ঠ সংবাদ পরিবেশনে তার অটল অঙ্গীকারের কারণে। দেশ ও জাতির বিভিন্ন ক্রান্তিকালে সমকালের অবদান অনস্বীকার্য। অতীতের ধারাবাহিকতায় সাহসী, নির্মোহ ও বস্তুনিষ্ঠ সাংবাদিকতা চর্চায় সমকালের অব্যাহত ভূমিকা প্রশংসার দাবিদার। দৈনিক সমকাল সঠিক তথ্য প্রকাশে অবিচল নিষ্ঠা বজায় রেখেছে এবং গণতন্ত্র ও নাগরিকদের অধিকার রক্ষায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। এনআরবিসি ব্যাংক সিকিউরিটিজ লিমিটেড পরিবার, অতীতের মতোই জনগণের অধিকার রক্ষায় এবং গণতন্ত্রের চেতনাকে সমুন্নত রাখতে সমকালের সাহসী প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখবে বলেই আশা রাখে। এই গুরুত্বপূর্ণ উপলক্ষ্যে আমরা দৈনিক সমকালের উত্তরোত্তর সাফল্য এবং আরও অনেক বছরের বলিষ্ঠ অবদান কামনা করছি।

আপনাদের আস্থাই আমাদের শক্তি

NRBC BANK SECURITIES LTD
A Subsidiary of NRB Commercial Bank Limited

- নির্ভুল ও দক্ষতার সাথে DSE ও CSE তে ট্রেড সম্পাদন
- বাংলাদেশী ও প্রবাসীদের জন্য সহজে আইপিও আবেদন সুবিধা
- সহজ উপায়ে ও প্রতিযোগিতাপূর্ণ হারে মার্জিন লোন সুবিধা
- প্রাতিষ্ঠানিক বিনিয়োগকারীদের জন্য ট্রেডিং টার্মিনাল সুবিধা
- ইমেইলের মাধ্যমে শেয়ার মূল্যায়ন, দৈনিক শেয়ারবাজার সারসংক্ষেপ জানার সুবিধা
- ইমেইলে দৈনিক পোর্টফোলিও প্রাপ্তির সুবিধা
- যেকোনো প্রান্ত থেকে ট্রেডিংয়ের জন্য DSE MOBILE App এর সুবিধা
- বিও হিসাব খোলা, রক্ষণাবেক্ষণ ও শেয়ার হস্তান্তর সহ সকল প্রকার সিডিবিএল সুবিধা

প্রধান শাখা: হাদি ম্যানশন (৪র্থ তলা, দক্ষিন পার্শ্ব), ২, দিলকুশা বা/এ, ঢাকা-১০০০
ইমেইল: info@nrbcbanksecurities.com
ওয়েব: nrbcbanksecurities.com

البنكية الإسلامية
EBL Islamic Banking

Eastern Bank PLC.

ইবিএল ইসলামিক ব্যাংকিং
বিশ্বাসে হোক সহজ ব্যাংকিং
শরীয়াহ্‌ভিত্তিক আধুনিক ব্যাংকিং সেবা নিয়ে এলো ইস্টার্ন ব্যাংক

বিনিয়োগ করুন শেয়ারে, পূবালীর কেয়ারে...

আমাদের সেবাসমূহ ঃ

- একক (Individual), যৌথ (Joint), প্রবাসী (NRB), Corporate বা Company বি.ও. (BO) হিসাব খোলার সুবিধা
- ঢাকা এবং চট্টগ্রাম স্টক এক্সচেঞ্জের মাধ্যমে ট্রেডিং সুবিধা প্রদান
- মোবাইল ট্রেডিং সুবিধা প্রদান
- দ্রুততম এবং ঝামেলাহীন আইপিও আবেদন এর সুযোগ
- পেশাদার জনবল দ্বারা দ্রুত ও সর্বোত্তম সেবা প্রদান
- সরকারী সিকিউরিটিজ (ট্রেজারি বন্ড) প্রাইমারী অকশন এবং সেকেন্ডারী মার্কেটে ক্রয় বিক্রয়ের সুবিধা
- Full Service DP হিসেবে CDBL এর সকল সেবা প্রদান
- বাজারের সবচেয়ে কম Interest Rate -এ মার্জিন লোন প্রদান

যোগাযোগ ঃ

প্রধান কার্যালয়

পূবালী ব্যাংক সিকিউরিটিজ লিমিটেড
এ-এ ভবন (৮ম তলা),
২৩ মতিঝিল বা/এ, ঢাকা-১০০০
ফোনঃ ০৯৬৬৬৮২৯৭৯১-৯৫
মোবাইল ঃ০১৯৭২৯৯৯৯৩৯, ০১৯২৯৯১৩০২৩
ই-মেইল ঃ info@pbsbangla.com

শাখা অফিস

গুলশান শাখা
ডিএনসিসি সুপার মার্কেট,
এফ-৩০ (২য় তলা), গুলশান-২, ঢাকা
ফোনঃ ৮৮৮১২৭০
মোবাইল ঃ ০১৭১৩১৩১৫৪৩
ই-মেইল ঃ gulshanbranch@pbsbangla.com

ডিজিটাল বুথ ঃ

গুলশান সার্কেল-১ ডিজিটাল বুথ
বসতি এরিস্টোক্র্যাটস, প্লট-৬,ব্লক- SW(H) ,
বীর উত্তম মীর শওকত সড়ক, গুলশান, ঢাকা
মোবাইল ঃ ০১৯২৯৯১৩০১৮
ই-মেইল ঃ gulshancircle@pbsbangla.com

জনসন রোড ডিজিটাল বুথ
লাল মোহন সাহা সড়ক, ওয়ারী, ঢাকা-১১০০
মোবাইল ঃ ০১৯২৯৯১৩০১৬
ই-মেইল ঃ johnsonroad@pbsbangla.com

ধানমন্ডি ডিজিটাল বুথ
বাসা নং-৩৯/এ, সড়ক নং-১৪/এ,
ধানমন্ডি আ/এ, ঢাকা-১২০৯
মোবাইল ঃ ০১৯২৯৯১৩০১৪
ই-মেইল ঃ dhanmondi@pbsbangla.com

সিলেট ডিজিটাল বুথ
আর.এন. টাওয়ার (৬ষ্ঠ তলা),
হোল্ডিং# ২৭২, চৌহাট্টা, সিলেট
মোবাইল ঃ ০১৭১১৩৬০৬১৯
ই-মেইল: chowhatta@pbsbangla.com

নারায়ণগঞ্জ ডিজিটাল বুথ
টি. এস. এন প্লাজা (২য় তলা)
১১১ বঙ্গবন্ধু রোড, নারায়ণগঞ্জ
মোবাইল ঃ ০১৭১০৫৬৮৭৭৪
ই-মেইল: narayangonj@pbsbangla.com

রাজশাহী ডিজিটাল বুথ
দৈনিক বার্তা ভবন (৩য় তলা), হোল্ডিং# ২৬৯, ওয়ার্ড# ২৩
নাটোর রোড, আলুপট্টি, বোয়ালিয়া, রাজশাহী
মোবাইল ঃ ০১৭৩৪৮০৭৬১২
ই-মেইল: rajshahi@pbsbangla.com

রংপুর ডিজিটাল বুথ
পেপার প্যালেস টাওয়ার (৪র্থ তলা), হোল্ডিং# ১৪২৬২, ওয়ার্ড # ২৫
সেন্ট্রাল রোড, পায়রা চত্বর, রংপুর সদর, রংপুর
মোবাইল ঃ ০১৫২১৩১৮২৮৭
ই-মেইল: rangpur@pbsbangla.com

মেম্বারশীপ ঃ

ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জ লিমিটেড, ট্রেক নং-২১৪, চট্টগ্রাম স্টক এক্সচেঞ্জ লিমিটেড, ট্রেক নং-১০৫

পূবালী ব্যাংক সিকিউরিটিজ লিমিটেড
PUBALI BANK SECURITIES LIMITED

২০ বছরে
সমকাল
মুক্তপ্রাণ। মুক্তধারা

Alif Group proudly celebrates Samakal's 20-year journey of bringing the people's voices to light.
Thank you for your commitment to truth and impactful journalism.

ALIF GROUP
Since 1967

Corporate office: Bilquis Tower (9th Floor)
House # 06, Road # 46, Gulshan # 02, Dhaka-1212, Bangladesh

গণ আন্দোলনের গ্রাফিতিতে শিক্ষার্থীদের অসাম্প্রদায়িক চেতনার প্রকাশ

অভ্যুত্থান-পরবর্তী বাংলাদেশের রাজনীতি

হাসনাত কাইয়ুম

প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী আয়োজন

৫ আগস্ট-পরবর্তী বাংলাদেশে রাজনীতির 'প্যারাডাইম'-এ বদল ঘটেছে। গত ৫৩ বছরের রাজনীতি ছিল মূলত তিন ধারায় বিভক্ত। প্রধান ধারা বা যেটাকে মূলধারার রাজনীতি বলা হতো, সেটা ছিল 'প্রহসনের নির্বাচনী রাজনীতি'র ধারা। প্রধানত আওয়ামী লীগ, বিএনপি, জাতীয় পার্টি এবং তাদের সহযোগীদের এ ধারার অন্তর্ভুক্ত ধরা হতো। অন্যদিকে একটা ছিল বাম বিপ্লবী ধারা, আর অন্যটা ইসলামী বিপ্লবী ধারা। এ তিন ধারার বাইরে অন্য একটি রাজনৈতিক ধারা গড়ে তোলার চেষ্টা হচ্ছিল এক দশকেরও বেশি সময় ধরে। প্রথমে বিচ্ছিন্ন আকারে, পরে কর্মসূচি আকারে এবং সর্বশেষ মাঠের রাজনীতি আকারেই এ ধারা সামনে এসে দাঁড়িয়েছে 'রাষ্ট্র সংস্কারের রাজনীতি' পরিচয় নিয়ে। এ ধারা যে প্রচলিত তিন ধারার বাইরের একটি নতুন ধারা, সে বিষয়টি এখনও অতটা স্পষ্ট নয়; কারণ প্রচলিত রাজনৈতিক দলগুলোর অনেকেই বর্তমানে নিজেদের রাষ্ট্র সংস্কারের পক্ষের বা অনেকে নিজেদের এই রাজনীতির প্রবর্তক বলেও দাবি করছে।

দুই.

বাংলাদেশে এর আগে যত আন্দোলন হয়েছে, শুরুর দিকে তার দাবিদাওয়ায় যত বৈচিত্র্যই থাকুক না কেন চূড়ান্ত পর্বে পৌঁছতে পৌঁছতে তা এক দফা তথা সরকার বদলের আন্দোলনে রূপান্তরিত হয়ে যেত। এবার সেই ঘটনার পুনরাবৃত্তি ঠেকিয়ে দেওয়ার বিষয়ে সচেতন তৎপরতা ছিল এবং ৭ জানুয়ারির নির্বাচনের আগে আগে, যুগপৎ আন্দোলন যখন এক দফার আন্দোলনে উপনীত হয়েছে, তখনও এক দফার মধ্যে অন্তত পাঁচটি দাবিকে অনুক্ত রাখা সম্ভব হয়েছিল। যুগপৎ আন্দোলন সরকার পতনে ব্যর্থ হওয়ার পর নির্বাচনী প্রহসন উত্তর পরিবেশে ছাত্ররা যখন কোটা সংস্কারের দাবিতে মাঠে নামে এবং খুনি হাসিনা যখন নির্মম বলপ্রয়োগের মাধ্যমে সবাইকে হত্যা করে আন্দোলন দমাতে মরিয়া হয়ে ওঠে, তখন আবু সাঈদের আত্মত্যাগের পথ ধরে জনগণের ব্যাপক অংশগ্রহণ এবং আকাঙ্ক্ষার চাপ কোটা সংস্কারের আন্দোলনকে সরকার পতনের আন্দোলনে রূপান্তর করতে সক্ষম হয়। তবে সরকার পতনের এক দফা শুধু সরকার উচ্ছেদের দাবিতে সীমাবদ্ধ থাকেনি, 'সরকার আর শাসনব্যবস্থা বদলের দাবি' আগে থেকেই একাকার হয়েছিল। ফলে খুনি হাসিনার পতন এবং স্বৈরতান্ত্রিক ক্ষমতা কাঠামো বদলের দাবি এক দফার অপরিহার্য অংশ হিসেবে একসঙ্গেই সামনে আসে।

তিন.

খুনি হাসিনার পলায়নের মধ্য দিয়ে এক দফার প্রথমাংশের বাস্তবায়ন হয়ে গেছে। এখন বাকি কাজ একটাই; রাষ্ট্র সংস্কার তথা সংবিধান সংস্কার।

দলের অধিকাংশই, দল গঠনের সময়ে অথবা পরবর্তী সময়ে যেসব আদর্শকে জনপ্রিয় আদর্শ মনে করেছে, সেইসব আদর্শকে দলীয় জনপ্রিয়তা বৃদ্ধির লক্ষ্যে দলীয় আদর্শ হিসেবে গ্রহণ করেছে। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই দলের নেতাকর্মী সেইসব আদর্শের বিপরীত জীবন চর্চা করেছে কিন্তু বক্তব্য বিবৃতিতে নিজেদের গৃহীত সেইসব আদর্শের ধারক-বাহক হিসেবে দাবি করে গেছে। স্বাভাবিকভাবেই এর ফল হয়েছে নেতিবাচক, মানুষ দলীয় নেতাকর্মীর অপকর্মের সমালোচনা করতে গিয়ে সেইসব আদর্শকেও সমানভাবে পরিত্যাজ্য কিংবা ঘৃণিত তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করেছে।

বর্তমান প্রজন্মের অনেকেই নিজেদের 'পোস্ট ইডিওলজিক্যাল' বা আদর্শভিত্তিক রাজনৈতিক যুগের পরবর্তী প্রজন্ম হিসেবে পরিচয় দেয়। কিন্তু দুর্ভাগ্য, তাদের অনেকের বক্তব্য এবং কাজের মনোযোগ, অনেকাংশে কথিত আদর্শভিত্তিক রাজনৈতিক দলগুলোর মতোই রয়ে গেছে। মানুষ যেসব তর্ককে পেছনে ফেলে এসেছে, যখন ব্যক্তিকেন্দ্রিক রাজনীতিকে পেছনে রেখে সমাধানভিত্তিক রাজনীতিতে এগিয়ে যাচ্ছে, তখনও কেউ কেউ মানুষের মনোযোগকে সেইসব পরিত্যাজ্য বয়ানের মাঝেই আটকে রাখছে।

ছয়.

আধুনিক রাষ্ট্রে ক্ষমতাকে মোটাদাগে দুই ভাগে ভাগ করা হয়; একটা 'সফট পাওয়ার', অপরটা 'হার্ড পাওয়ার'। রাষ্ট্রের 'সফট পাওয়ার' হলো তার শিক্ষা, সংস্কৃতি, মতাদর্শ ইত্যাকার অবস্তুগত উপাদানসমূহ, যা সহজে দৃশ্যমান করা যায় না। অন্যদিকে রাষ্ট্রের 'হার্ড পাওয়ার' হলো তার আইনকানুন-পুলিশ-মিলিটারি-কোর্টকাচারি-জেলখানাসহ বলপ্রয়োগকারী নানান প্রতিষ্ঠান; যা সহজেই মানুষকে চেনানো যায়, যার নির্মমতার ভেতর দিয়ে তাদের প্রতিনিয়ত পার হতে হয়। ব্রিটিশ কলোনিয়াল ধাঁচের রাষ্ট্র আর স্বাধীন গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলোর মধ্যে অনেক পার্থক্য আছে। স্বাধীন রাষ্ট্রগুলো পরিচালনার ক্ষেত্রে 'সফট পাওয়ার' যত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে, আমাদের বেলায় তা নয়। আমাদের রাজনৈতিক দলগুলো জানে এবং জনগণও অনেকটা মেনে নেয়, আদর্শের কথা যাই বলা হোক না কেন, আসল বিষয় হলো 'দমনের ক্ষমতা'। এবং এই ক্ষমতা ধরে রাখার জন্য পুলিশ-মিলিটারি-আইন-আদালত-রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানগুলোকে চরমভাবে নষ্ট করতে পারা এখানে নেতৃত্বের যোগ্যতা হিসেবে বিবেচিত হয়। আর সেইসব 'যোগ্য নেতাদের' অধীনে রাষ্ট্রক্ষমতার সুফলভোগীরা সকলে মিলে সিন্ডিকেট গড়ে তুলতে উদগ্রীব থাকে। এইসব সিন্ডিকেটের মূল শক্তি যে রাষ্ট্রের 'হার্ড পাওয়ার', এটা প্রত্যক্ষ করলেও আমাদের 'শিক্ষিত মানুষের মন' এই হার্ড পাওয়ারের চেয়ে 'সফট পাওয়ার' নিয়ে আলোচনা করতে অধিকতর স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করে। অতি প্রয়োজনীয় আলোচনায় কম মনোযোগ দিয়ে কম প্রয়োজনীয় আলোচনায় অধিক মনোযোগ দিলে মানুষ আগ্রহ হারায় এবং তাদের নিজেদের ভোগান্তির অভিজ্ঞতার কারণে যে বাস্তব ঐক্য গড়ে উঠতে পারত, তা ক্ষতিগ্রস্ত হয়। তখন সকলেই লিপ্ত হয় যার যার পছন্দের দার্শনিক ঘরানার সঠিকতা প্রতিষ্ঠা করতে আর 'ব্রিটিশের বিভাজন নীতি' অবিরাম খেলা করে আমাদের অন্তর্গত রক্তের ভেতরে।

সাত.

এ দেশের মানুষের '২৪-এর চেয়ে অনেক বেশি গাঢ় এবং দৃঢ়ভাবে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার অভিজ্ঞতাও আছে। '৭১ সালে আমরা যেভাবে ঐক্যবদ্ধ হয়েছিলাম, পৃথিবীর ইতিহাসে তেমন ঐক্যের নজির খুব একটা নাই। সে ঐক্য আমরা বেশিদিন ধরে রাখতে পারি নাই। কারণ জনগণ যাঁর মাঝে তাদের আশা-আকাঙ্ক্ষার প্রতিফলন দেখতে চেয়েছিল, যাঁকে তারা আর কোনো নির্দিষ্ট দলের সীমার মাঝে আটকে রাখতে চায় নাই, তিনি জনগণের সেই আকাঙ্ক্ষাকে উপেক্ষা করে, তার দলের সর্বেসর্বা এবং রাষ্ট্রক্ষমতার মালিক হওয়ার পথ বেছে নিয়েছিলেন। এর ফল হয়েছিল ভয়াবহ, অচিরেই তিনি জনগণের স্বপ্ন থেকে ছিটকে বাইরে চলে যান। অতি অল্প সময়ের মধ্যে তাঁর দলীয় ছাত্রদের একাংশকে তিনি পারিবারিক আত্মীয়তাকে গুরুত্ব দিতে গিয়ে বর্জন করেন এবং ক্রমশ এই পথ ধরে দেশের ইতিহাসে সৃষ্টি হওয়া সর্বোচ্চ সুযোগটিকে তিনি নিজের, পরিবারের, দেশের, সকলের জন্য মহাদুর্যোগে পরিণত করেন।

ইতিহাস তার সমগ্র শিক্ষা নিয়ে আমাদের সামনে দণ্ডায়মান। আমরা দলীয় লোকজন সমগ্র জাতির হয়ে উঠতে পারি নাই, কিন্তু ইতিহাস এমন এক বৃহৎ কর্তব্য আমাদের সামনে হাজির করেছে, যা কোনো দলের পক্ষে সম্পন্ন করা সম্ভব নয়, কেবল সকল ধরনের মানুষ সমঝোতায় পৌঁছতে পারলেই সম্পন্ন করা সম্ভব, তেমন পরিস্থিতিতে, সময় যাদেরকে নেতা হিসেবে উদ্ভাবন করেছে, তারা যদি তাদের ওপরে অর্পিত আকাঙ্ক্ষার চরিত্র উপলব্ধি করতে সক্ষম হয় তাহলেই মঙ্গল, অন্যথায় আবারও বেহাত হতে পারে বিজয়। তবে সমস্ত অদক্ষতা, অনভিজ্ঞতা, লোভ ইত্যাকার সমস্যা সত্ত্বেও সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সত্য এই যে, আমাদের তরুণরা পাল্টে গেছে। তারা তাদের চিন্তার শক্তি এবং ঐক্যের জোর সম্পর্কে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা অর্জন করেছে। '৭১-এর পরে এমন অভিজ্ঞতা অর্জনের সৌভাগ্য অন্য কোনো জেনারেশনের হয়নি। তারা মোটাদাগে তাদের নিজেদের নতুন রাজনীতিও চিহ্নিত করতে পেরেছে। রাষ্ট্র সংস্কারের মাঝে যে এখানকার রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক এবং সাংস্কৃতিক সংকটের সমাধান নিহিত, এটা তারা যেভাবে উপলব্ধি করেছে, এই উপলব্ধি থেকে তাদের বিচ্যুত করা আর কোনো শক্তির পক্ষেই সম্ভব হবে না। রাষ্ট্র সংস্কারের ধারণাকে আরও ব্যাপক এবং আরও গভীর করার দাবি উঠতে পারে কিন্তু সংস্কারের চাইতেও কম কিছু এ প্রজন্মকে আর আকৃষ্ট করবে না। ৫০ বছর ধরে 'এক দল অন্য দলকে দোষারোপ করার যে রাজনীতি' দেশকে নিয়ন্ত্রণ করেছে, সে রাজনীতির কবর হয়েছে এ অভ্যুত্থানে। অভ্যুত্থানোত্তর বাংলাদেশে রাজনৈতিক দলগুলোকে প্রকৃত অর্থেই রাজনীতি করেই টিকে থাকতে হবে, পূর্বসূরিদের বিক্রি করে আর প্রাসঙ্গিক থাকা যাবে না। প্রত্যেক দলকেই ক্ষমতায় যাওয়ার পরে রাষ্ট্রের কোন বিষয়ের কী পরিবর্তন, কোনভাবে করবেন, তার পরিকল্পনাসমেত কর্মসূচি হাজির করতে হবে। এবং ঘোষিত কর্মসূচি বাস্তবায়ন না করে, 'দমনের ক্ষমতা' ব্যবহার করে আর যাতে কেউ রাষ্ট্রক্ষমতা আঁকড়ে ধরে রাখতে না পারে, তার নিশ্চয়তাও আদায় করবে এ প্রজন্ম। আবু সাঈদের দিগন্ত প্রসারিত হাত আর বন্দুকের দিকে চেতানো বুককে আর পেছনে ফেরানো সম্ভব হবে না, ইতিহাসের দেয়ালে এর গতিপথ আঁকা হয়ে গেছে। আগামীর রাজনীতি সে পথেই হাঁটবে। ❖

কিন্তু রাষ্ট্র কিংবা সংবিধান সংস্কারের রাজনীতি গত ৫৩ বছরের চলতি রাজনৈতিক ঘরানার নয়, নতুন ধরনের। সংস্কারের প্রয়োজন আছে– মানুষ এটা অনুভব করছে কিন্তু কতটুকু সংস্কার, কারা, কোন পথে করবে, কোনভাবে করলে সংস্কার ঠিকঠাক হবে– এসব নিয়ে দ্বিধা এবং মতপার্থক্য আছে। এ ধরনের পরিবর্তনের জন্য উপযুক্ত রাজনৈতিক পরিবেশ তৈরি করার ক্ষেত্রে আমাদের নিজেদের অভিজ্ঞতার ঘাটতিও আছে। নির্বাচনের রাজনীতির অভিজ্ঞতা আমাদের যা আছে তা হচ্ছে, একে অপরকে পরাজিত করার জন্য কাজ করার অভিজ্ঞতা। কিন্তু সংবিধান গ্রহণ কিংবা গৃহীত সংবিধানের ত্রুটি-বিচ্যুতি দূর করে সময়োপযোগী করার যে রাজনীতি, তাতে রাষ্ট্রের সকল অংশের মানুষের সম্মতি পাওয়ার যে রাজনীতি, সকলের মধ্যকার পার্থক্য, ভিন্নমত সত্ত্বেও সকলে সম্মানজনকভাবে বাঁচার, বসবাসের, বিরোধ করবার এবং বিরোধ নিষ্পত্তির পথ পদ্ধতি গ্রহণের যে রাজনীতি, তা সাধারণভাবে একে অপরকে পরাজিত করবার রাজনীতি থেকে আলাদা। এই নতুন রাজনীতি বাংলাদেশের অভিজ্ঞতায় নাই কিন্তু তার প্রয়োজন ভীষণভাবে হাজির হয়েছে। এই নতুন প্রয়োজন মেটানোই এখনকার রাজনীতির প্রধান চ্যালেঞ্জ।

চার.

'২৪-এর অভ্যুত্থান যে পথে সংঘটিত এবং সফল হয়েছে, তার মধ্যে এই নতুন রাজনীতির ইশারাটা ছিল। জনগণ এবং প্রায় সকল রাজনৈতিক দল, যাদের নেতৃত্বে আন্দোলনে শামিল হয়েছিল, নেতৃত্বদানকারী ছাত্রদের সেই অংশটা কিন্তু দলীয় পরিচয়ের বাইরে ছিল এবং আন্দোলনের সফলতার ভেতর দিয়ে তারা দলীয় পরিচয়ের সকল সীমাবদ্ধতাকে অতিক্রম করে সমগ্র জাতির হয়ে উঠেছিল। অন্তর্বর্তী সরকার গঠনের আগমুহূর্তে এ আলোচনা এসেছিল যে সরকার কি সর্বদলীয় হবে, দলীয় রাজনীতিবিদ এবং আমলাদের অংশগ্রহণে মিশ্র ধরনের হবে, নাকি দলনিরপেক্ষ বিশিষ্টজনদের নিয়ে গঠিত হবে? অল্পক্ষণ স্থায়ী সভায় খুব অল্প আলোচনার মধ্য দিয়েই উপস্থিত সকলে এ সিদ্ধান্তে আসতে পেরেছিলেন যে, সরকার দলনিরপেক্ষদের নিয়েই গঠিত হবে এবং যাদেরকে নিয়ে যেভাবেই তা গঠিত হোক না কেন, সেটা আন্দোলনকারী ছাত্রনেতাদের সঙ্গে আলাপ আলোচনা করে, তাদের মতামতের ভিত্তিতে গঠিত হতে হবে। সম্মিলিত এসব সিদ্ধান্তেও জাতীয় ঐক্যের একটা ইশারাই ছিল।

পাঁচ.

এই মুহূর্তে সবচেয়ে ইতিবাচক মানুষও বলবে না, যে ঐক্য গড়ে উঠেছিল জুলাই-আগস্টে, সেই ঐক্য এখনও অটুট আছে। এই না থাকার কারণ বিশ্লেষণ করে বিভিন্ন জনকে দোষারোপ করলে যে হারানো ঐক্য আবার দৃঢ় হবে তেমনটা আশা করার কোনো যৌক্তিক কারণ নাই, তাই সেটা নিয়ে এ মুহূর্তে আলাপ অপ্রয়োজনীয়। কিন্তু বিদ্যমান ক্ষয়প্রাপ্ত ঐক্য নিয়েও বিজয়ের যতটুকু সংহত করা সম্ভব, সেটুকু কোন পথে করা যাবে, সে পথ আবিষ্কার করতে পারাই এ সময়ের রাজনীতির আরেকটা চ্যালেঞ্জ। আমাদের প্রচলিত রাজনীতির প্রায় সবটুকুই দৃশ্যত আদর্শভিত্তিক রাজনীতি, দলীয় নেতাকর্মীর জীবনে সেইসব আদর্শের ছায়া থাকুক বা না থাকুক। এইসব

প্রধান সমন্বয়কারী
রাষ্ট্র সংস্কার আন্দোলন

প্রেক্ষাপট, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ

► ২ পৃষ্ঠার পর

নব্বইয়ের গণঅভ্যুত্থান সেই অর্থে তেমন ব্যাপকও ছিল না। মূলত দেশের বড় শহরগুলোকে কেন্দ্র করে আন্দোলন হয়েছিল। বিশেষ করে রাজধানীকে কেন্দ্র করে। ঢাকার বাইরে চট্টগ্রামে এর দশ ভাগের এক ভাগ আন্দোলন হয়নি। রাজধানীর তীব্র এ আন্দোলন, কারফিউ, কারফিউ-ভাঙা প্রভৃতির ফলে এরশাদের পতনের সম্ভাবনা নিশ্চিত হয়। এরশাদ ক্ষমতা ছাড়তে বাধ্য হলেন কারণ, তাঁর ক্ষমতার ভিত্তি ছিল সামরিক বাহিনী। সামরিক বাহিনী তাঁকে জানিয়ে দিল তারা এই ভার আর বহন করতে রাজি নয়। ফলে দ্রুত সমাধান এলো। এরশাদ নিজেই সিদ্ধান্ত নিয়ে ক্ষমতা ছেড়ে দিলেন।

সেই নব্বইয়ের পর, বিশাল এক গণঅভ্যুত্থান হলো এ বছর, ২০২৪ সালে। এ আন্দোলন বা অভ্যুত্থানে অনেক রক্তপাত হলো, অনেক ক্ষয়ক্ষতি হলো কিন্তু শেষ পর্যন্ত স্বৈরাচারী শেখ হাসিনা ক্ষমতা ধরে রাখতে পারলেন না। যদিও তিনি চেষ্টা করেছিলেন কঠোর দমননীতি চালিয়ে, ব্যাপক হত্যাকাণ্ড ঘটিয়ে এই আন্দোলন ব্যর্থ করে দিতে।

আমরা যখন নারী-পুরুষের মধ্যে তুলনা করি তখন মনে করি নারীরা পুরুষের চাইতে দুর্বল। রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন– 'দুর্বলের অত্যাচার ভয়ানক'। এখন শেখ হাসিনা 'নারী শাসক' হিসেবে যদি দুর্বল হন, তাঁর অত্যাচারটা ছিল ভয়াবহ। মানুষের ওপর কতভাবে অত্যাচার করা যায়, সেই ক্ষেত্রে, শেখ হাসিনা অনন্য উদাহরণ সৃষ্টি করেছিলেন। গুম, খুন, কারাবন্দি করা, 'আয়নাঘরে' বন্দি করা থেকে শুরু করে বহু কিছুই তাঁর শাসনামলে ঘটেছে। বিশেষ করে গত সাড়ে পনেরো বছরে।

এ আন্দোলনটি যে এত বিশাল আন্দোলন হবে, এত ব্যাপক আন্দোলন হবে, সেটি আমরা অনেকেই ভাবতে পারিনি। কারণ, আন্দোলনটা ছোট একটা ইস্যুকেন্দ্রিক ছিল। ইস্যু ছিল সরকারি চাকরিতে কোটার সংস্কার। এ আন্দোলনের প্রাথমিক স্লোগান ছিল– 'কোটা না মেধা? মেধা মেধা'। এ আন্দোলন শেষ পর্যন্ত 'একদফা'র আন্দোলন হয়ে গেল। এত তীব্র হলো সে আন্দোলন যে, শেখ হাসিনা পদত্যাগ করে দেশ ছেড়ে চলে যেতে বাধ্য হলেন।

এ আন্দোলনের পর দেখা গেল, পুরো পুলিশ বাহিনী উধাও হয়ে গেছে। পুলিশ বাহিনীকে বাদ দিয়ে রাষ্ট্র কল্পনা করা যায় না। রাষ্ট্রের পুলিশ বাহিনী যদি পালিয়ে যায় তাহলে বুঝতে হবে অত্যাচারের পরিধি কত বিস্তৃত ও ভয়ানক ছিল। এই পুলিশ অত্যাচার করেছে বলেই মাঠে-ময়দানে তারা নামতে পারছে না। যারা কর্মক্ষেত্রে ফিরে এসেছেন তারা চেষ্টা করছেন নিজেদের থানার মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখতে। পৃথিবীর ইতিহাসে আমরা এ রকম নজির হয়তো পাব না। আন্দোলনের ব্যাপকতা আমরা এ থেকেই বুঝতে পারি।

আন্দোলনের প্রশ্নে সামরিক বাহিনীর মধ্যে আন্দোলনকে সমর্থন করার একটা মনোভাব লক্ষ করেছি। সেনা কর্তৃপক্ষ যে সভা করেছিলেন, তাদের কী করা উচিত সে সম্পর্কে, সেখানে দেখা গেছে, তরুণ অফিসাররা হত্যাকাণ্ড কিংবা নির্যাতনের সঙ্গে নিজেদের যুক্ত করতে রাজি হচ্ছিলেন না। আমরা যারা বিপ্লবী-বামপন্থি চিন্তাভাবনা করি, তারা জানি রাষ্ট্রের সামরিক বাহিনী রাখা হয় শেষ পর্যন্ত শ্রেণিরাষ্ট্রের প্রতিপক্ষকে দমন করার জন্য। কিন্তু আমাদের দেশে এটা একটা ভিন্ন নজির হয়ে গেল। সামরিক বাহিনী বিপ্লব দমন করার জন্য নামানো হয়েছিল, কারফিউ জারি করা হয়েছিল, আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদের ঘোষণা দিয়েছিলেন– রাস্তায় নামলে দেখামাত্র গুলি করা হবে; আমরা বিষয়টার ওপর লক্ষ রেখেছিলাম। কিন্তু কারফিউ যতটা কঠোর হওয়ার কথা ছিল, ততটা হয়নি। যেভাবে সামরিক বাহিনীর গুলি করার কথা ছিল সেটিও তারা করেনি। গুলির কাজটা বেশির ভাগ করেছে পুলিশ বাহিনী। পুলিশ বাহিনীকে রাজনৈতিকভাবে পক্ষপাতদুষ্ট করে তোলা হয়েছিল। পুলিশ বাহিনীর আওয়ামীকরণ বা দলীয়করণ সহজ হয়ে গিয়েছিল এই শাসনামলে। এই দলীয়করণের প্রভাব সেনাবাহিনীতেও পড়েছে, তবে ততটা ব্যাপক বা বিশাল হতে পারেনি। সেনাবাহিনী সিদ্ধান্ত নিল, তারা গুলি চালাবে না, মানুষ হত্যা করবে না। এ সিদ্ধান্ত জানার পর শেখ হাসিনা বুঝতে পারলেন, তাঁর পক্ষে আর ক্ষমতার আসন আঁকড়ে রাখা সম্ভব হবে না। তারপরও তিনি পদত্যাগ করতে রাজি ছিলেন না। তাঁকে বুঝিয়ে শুনিয়ে, বিশেষ করে তাঁর ছেলে জয়ের কথায়, শেষ পর্যন্ত তিনি রাজি হন। তিনি যদি থাকতেন, তাহলে আরও বড় ধরনের রক্তপাত হতো। তাঁরও জীবন বিনাশ হতে পারত। সেটি থেকে তিনি রক্ষা পেয়েছেন। পার্শ্ববর্তী দেশ ভারতে চলে গেছেন।

এই আন্দোলনের ফলে আওয়ামী লীগের পতন হলে খুব বড় আকারে রক্তপাত হবে বলে মনে করা হয়েছিল। ওবায়দুল কাদের বলেছিলেন– আমরা যদি ক্ষমতা থেকে চলে যাই, সে রাতেই পাঁচ লাখ লোক মারা যাবে। আমরা অত্যন্ত সৌভাগ্যবান এই জন্য যে, এত বড় বিশাল একটা আন্দোলনে প্রতিশোধপরায়ণতা খুবই সীমিত আকারে হয়েছে। পাঁচ লাখ মানুষের মৃত্যুর মতো ঘটনা ঘটে নাই। এটি আমাদের মাথায় রাখতে হবে, বিশাল গণজোয়ার, গণঅভ্যুত্থানের পর কিছু না কিছু দুর্ঘটনা ঘটবেই। ভারতে ইন্দিরা গান্ধী তাঁর শিখ দেহরক্ষীদের হাতে যখন নিহত হলেন তখন বিশেষ করে দিল্লিতে শিখদের বিরুদ্ধে দাঙ্গা হলো। সেই দাঙ্গায় চার থেকে পাঁচ হাজার শিখকে হত্যা করা হলো। এ নিয়ে সাংবাদিকরা যখন রাজীব গান্ধীকে প্রশ্ন করেছিল– কেন ঘটল এমন সাম্প্রদায়িক ঘটনা? রাজীব গান্ধী জবাব দিয়েছিলেন, 'একটা বিশাল বটবৃক্ষ যখন উৎপাটিত হয় বা নুয়ে পড়ে তখন মেদিনী তো কেঁপে উঠবেই।' এই হত্যাকাণ্ড ছিল প্রতিক্রিয়া এবং প্রতিক্রিয়াটা ভয়াবহ বীভৎস ছিল।

আমাদের দেশের মানুষ অনেক কষ্ট পেয়েছে। নির্যাতন করা হয়েছে। যে ধরনের নির্যাতন অতীতে ছিল না, সে ধরনের নির্যাতন করা হয়েছে। তারপরও কিন্তু আমরা বলবো, অন্যপক্ষের প্রতি প্রতিশোধ গ্রহণের যে চেষ্টা, তা সীমিত ছিল। এ জন্য আমরা বলি, বিশাল গণঅভ্যুত্থানে আন্তর্জাতিক মহলে, ভারতে যতই আলোচনা হোক, আমরা তো জানি এখানকার পরিস্থিতি কী ছিল।

পুলিশ বাহিনী অকার্যকর, তারপরও আইনশৃঙ্খলা যতটুকু রক্ষা হচ্ছে, তা সম্ভব হচ্ছে মানুষের সুস্থ চেতনার ফলে। তারপরও সারাদেশে কিছু কিছু ঘটনা ঘটছে, যেমন– পোশাক শ্রমিকরা বিক্ষোভ করছে, ছাত্ররা রাস্তায় নেমে পড়ছে, পেশাজীবীরা আন্দোলন করছেন দাবিদাওয়া নিয়ে; মিছিল, মিটিং করার চেষ্টা, রাজপথ অবরোধ করার চেষ্টা, এটা কেন হচ্ছে? অনেক মধ্যবিত্ত মানুষ এখন অনেকটা তাক্ত-বিরক্ত। অনেকেই হয়তো বলতে শুরু করেছেন, আগেই তো ভালো ছিলাম, এখন দেশে এতো অশান্তি। এর জবাব হচ্ছে, মাও সে তুংয়ের একটা কথা আছে– 'বিপ্লব কোনো ডিনার পার্টি নয়, বিপ্লব কোনো সূচিকর্ম নয়। বিপ্লব এতো মার্জিত, এতো সরল, এতো সহজ হতে পারে না।'

এই অভ্যুত্থানের মধ্য দিয়ে আরেকটা বিষয় প্রকাশ পেয়েছে, তা হলো– আমাদের সমাজে যত ধরনের ট্রেন্ড দীর্ঘদিন চাপা পড়ে ছিল, সেই ট্রেন্ডগুলো এ অভ্যুত্থানের মধ্য দিয়ে প্রকাশ পেয়েছে। যেমন, আমরা কোনোদিন কল্পনা করতে পরিনি, বাংলাদেশের মতো একটি দেশে মাজারের বিরুদ্ধে মানুষ ক্ষোভ প্রকাশ করবে। কিছু ক্ষুব্ধ মানুষ গিয়ে মাজার ভাঙা শুরু করবে, যে মাজারকে সহজসরল মানুষ অন্য চোখে দেখে। তারা মনে করে মাজারগুলোতে যারা শায়িত আছেন তারা অত্যন্ত ধর্মপরায়ণ, আল্লাহর প্রিয় মানুষ এবং এ জন্য মাজারের শায়িতের প্রতি তারা শ্রদ্ধা প্রকাশ করে এবং একে কেন্দ্র করে বার্ষিক ওরশসহ নানা ধরনের আচার-অনুষ্ঠান হয়। এছাড়াও বিচ্ছিন্নভাবে বিভিন্ন জায়গায় প্রতিপক্ষের ওপর হামলার ঘটনা ঘটছে। তারপরও আমি বলবো এসবের সংখ্যা তুলনামূলক কম।

এ আন্দোলনের মধ্য দিয়ে আমরা দেখলাম, একদিকে যেমন সেক্যুলার শক্তি আন্দোলনে যোগ দিয়েছে, অন্যদিকে ধর্মীয় গোষ্ঠীগুলো– বিশেষ করে ইসলামী দলগুলো এতে অংশ নিয়েছে। মোট কথা বলা যায় আমাদের সমাজে যতগুলো প্রবণতা আছে, যতগুলো বৈশিষ্ট্য আছে, যত ধরনের চিন্তা-চেতনা আছে, সবকিছুরই কিছু না কিছু বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে। আমরা যদি বাংলাদেশকে চিনতে চাই, বুঝতে চাই, তাহলে এ বিষয়গুলোকে বুঝতে হবে যে– আমাদের জাতিসত্তার মধ্যে, ভূখণ্ডের অন্তর্গত যে মানুষ তাদের মধ্যে, কত ধরনের চিন্তা ও চিন্তার বৈচিত্র্য আছে। তা ধর্মচিন্তাও হতে পারে, অন্য কোনো চিন্তাও হতে পারে।

অভ্যুত্থানের পরে আরেকটা জিনিস বলা হচ্ছে, আমরা বুঝতে পারছি, আমাদের রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানগুলো বিধ্বস্ত হয়ে গেছে। কোনোটাই আর সেইভাবে কার্যকর নয়। ভয়াবহ রকমের দলীয়করণের মাধ্যমে আমাদের আমলাতন্ত্র অকার্যকর, পুলিশ বাহিনী অকার্যকর, ব্যাংক-ইনস্যুরেন্সগুলো অপদখলসহ সব ধরনের অঘটন এখানে ঘটেছে। এর একটা ভালো দিক হলো, একটা দেশের অধঃপতন হলে সেই দেশটার চেহারা কেমন হতে পারে, বাংলাদেশে আমরা দেখলাম চিত্রগুলো বেরিয়ে আসছে। মিডিয়াতে আগে দুর্নীতির কথা শুনতাম, কিন্তু আন্দোলনের পরে আসল চিত্রটা বেরিয়ে আসছে। দুর্নীতির স্বরূপ বেরিয়ে এসেছে। আমাদের দেশে দারিদ্র্য, দুঃখ, বঞ্চনা থাকা সত্ত্বেও কেউ কল্পনা করতে পারিনি, পাশের বাড়ির লোকটাই এক হাজার কোটি টাকার মালিক হয়ে বসে আছেন। এমন ব্যক্তি অর্থবিত্তের মালিক হয়েছেন যাদের পক্ষে অত অর্থবিত্ত অর্জন করা সম্ভব নয় বলেই আমরা মনে করতাম। দেখলাম সেটিও সম্ভব হয়েছে।

এখন আমাদের কর্তব্য– কীভাবে আমরা আমাদের ঘরটা গোছাবো, আবার নতুন করে কাজে ঝাঁপিয়ে পড়ব তা বোঝা। এটি খুব সহজ নয়। বাংলাদেশ সম্পর্কে অনেকেই বলেন, এখানে একটা নতুন 'সোশ্যাল কন্ট্রাক্ট' হওয়া দরকার। 'সোশ্যাল কন্ট্রাক্ট' হওয়া মানে, মোটাদাগে বলতে পারি, এখানে একটা নতুন, যুগোপযোগী সংবিধান দরকার। পুরোনো যে সংবিধান আছে এর আলোকে কিন্তু রাষ্ট্র চলা সম্ভব নয়। আমরা একটি ভারসাম্যমূলক সংবিধান চালু করতে পারি। সংসদে পাস করিয়েও নিতে পারি। তবে আমাদের সমাজ যেভাবে চালু থাকার কথা সেভাবে কিন্তু সমাজ চলবে না। যে বন্দোবস্তের কথা বলা হচ্ছে, খুব সংক্ষিপ্ত সময়ে এটি অর্জন করা সম্ভব নয়। এটি তখনই অর্জন করা যাবে, যখন আমাদের সমাজে ক্ষমতার অনেক কেন্দ্র থাকবে এবং এগুলো একে অপরের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে ভারসাম্য প্রতিষ্ঠা করবে, যেন কেউ আর পরম ও চরম ক্ষমতার অধিকারী হতে না পারে।

শেখ হাসিনার শাসনামলে সবচেয়ে বড় ত্রুটি– সবকিছুই একজন ব্যক্তিকেন্দ্রিক হয়ে গিয়েছিল। আমি এক বুদ্ধিজীবীকে বলতে শুনলাম, শেখ হাসিনা এমন এক ব্যক্তিত্ব যার কর্মদক্ষতা তাঁর পিতাকে ছাড়িয়ে গেছে। এটি তাঁর সম্পর্কে একটি মূল্যায়ন। কেন এমন মূল্যায়ন? কারণ সমস্ত ক্ষমতা কেন্দ্রীভূত হয়ে গিয়েছিল। ফলে ফ্যাসিজমের প্র্যাকটিস করা সম্ভব হয়েছে। নির্যাতন চালিয়ে ক্ষমতা ধরে রাখাও সম্ভব হয়েছে দীর্ঘদিন। তাঁর বিরুদ্ধে কোনো রকম আন্দোলন-সংগ্রাম গড়ে উঠতে পারেনি চরম নিপীড়ন ও ভীতি সৃষ্টির কারণে। এখন আমরা যদি দেশটিকে সুন্দর জায়গায় স্থাপন করতে চাই, তাহলে সমাজে অনেক ক্ষমতাকেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করা উচিত বলে আমি মনে করি। যেটিকে বলা যেতে পারে মাল্টিপোলার সোসাইটি। এখানে একাধিক শক্তিকেন্দ্র থাকবে, যেগুলো একে অপরের সঙ্গে প্রতিযোগিতা করবে। তবে এটি হঠাৎ করে, এক বা দুই বছরে হবে না। এর জন্য সময় লাগবে।

অনেকে বলছেন আমরা এমন ব্যবস্থা করতে চাই, যাতে ফ্যাসিবাদের উত্থান আর না হয়। আকাঙ্ক্ষাটা মহৎ, কিন্তু বাস্তবায়নটা কঠিন। ক্ষমতা কেন্দ্রীভূতকরণের মধ্য দিয়ে ফ্যাসিবাদের উত্থান হয়। তখন যার হাতে ক্ষমতা কেন্দ্রীভূত হয়, সে আর অন্যকিছুকে তোয়াক্কা করতে চায় না। চায় না বলেই তার অভিমত ও ইচ্ছা অন্যদের ওপর চাপিয়ে দেয়, অন্যরা বাধ্য হয় সেই ইচ্ছা পালন করতে।

আমরা এতদিন আওয়ামী লীগ ও তাঁর নেতৃবৃন্দের কাছ থেকে বাংলাদেশ ও মুক্তিযুদ্ধের চেতনার যে বয়ান শুনতাম, সেটি এই অভ্যুত্থানের মধ্য দিয়ে বড় ধরনের চ্যালেঞ্জের মুখে পড়েছে। এতটাই যে, যে-শেখ মুজিবুর রহমান আওয়ামী লীগের বয়ানে প্রধান পুরুষ, যাঁর সম্পর্কে বলা হতো : হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙালি; যখন অভ্যুত্থান হলো, দেখলাম, মানুষ তাঁর ভাস্কর্যগুলো ভেঙে ফেলছে। সারাদেশে এই ভাস্কর্য ছিল। লেখাপড়ার ক্ষেত্রে, স্কুলের ছাত্রছাত্রীদের যে ইতিহাস পড়তে দেওয়া হতো, এক পেশে ইতিহাস, তখনও মনে হয়েছিল, এই দেশে বোধহয় আর কোনো পরিবর্তন সম্ভব নয়। কারণ আইডিওলজির ক্ষেত্রে আওয়ামী লীগ একটা আধিপত্যের অবস্থান অর্জন করেছে। কিন্তু যখন অভ্যুত্থান হলো, মনে হলো, আওয়ামী লীগ অর্থ ও লোকবল ব্যয় করে যে বয়ান তৈরি করেছে সেই বয়ান এই প্রজন্ম আদৌ গ্রহণ করেনি।

আমাদের এটিও ধারণা ছিল, এখনকার ছেলেমেয়েরা সেভাবে সমাজসচেতন নয়। ওরা স্বার্থপর। অনেকে মজা করে বলত ওরা 'ফার্মের মুরগি'র মতো। কিন্তু এই প্রজন্ম যেভাবে আন্দোলনে নামল, জীবন দিল, তা দেখার পর অন্তত আমাদের এই দেশ সম্পর্কে আশাবাদী হতে হয়। রাজনৈতিক দিক থেকে, সমাজচিন্তা ও দর্শনের দিক থেকেও আসলে তারা পিছিয়ে নেই। তারা দেশ ও জাতিকে কিছু দিতে চায় এবং বাংলাদেশ সম্পর্কে কিছু ভাবতে চায়। এটিই তাদের চেতনা। তারা সব জাতীয় লক্ষ্যকে নতুন করে চিহ্নিত করছে। এটা একটা বড় ধরনের 'ফেনোমেনা'। এইরকম 'ফেনোমেনা' আমি অন্তত আমার জীবদ্দশায় লক্ষ করিনি। ঊনসত্তরের আন্দোলনে নেতৃত্ব দিয়েছি, আন্দোলন করেছি। ঊনসত্তরের আন্দোলন দীর্ঘ ও ব্যাপক ছিল। তিন মাস ধরে আন্দোলন চলেছে। তা সত্ত্বেও সেই আন্দোলনে একটি জিনিসই এসেছিল নতুন, তা হলো স্বাধীন পূর্ববাংলার ধারণা। মাঠে ময়দানে স্লোগানে স্বাধীনতার প্রশ্নটা উচ্চকিত কণ্ঠে উচ্চারিত হয়েছে। এর বাইরে খুব একটা নতুন কিছু দেখিনি। কিন্তু এখানে ছাত্রদের আঁকা গ্রাফিতিগুলোয় দেখা যায়, বিভিন্ন মত, বিভিন্ন স্রোত এর মধ্যে রয়েছে। এমনকি পাহাড়ি ছাত্রছাত্রীরা তাদের স্থানভিত্তিক যে রাজনৈতিক দাবিদাওয়া আছে, সেগুলোকে কেন্দ্র করে গ্রাফিতি এঁকেছে। এটা আশা জাগায় এজন্য যে, বিরাট অভ্যুত্থানের ক্যানভাসে যখন ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীসহ আরও অনেক গোষ্ঠী জায়গা পায় এবং সেই জায়গাটিকে সম্মান করা হয়, তখন বিশ্বাস জাগে, জাতি হিসেবে আমরা অনেক টেকসই। যারা দেশ চালান, তারা যদি মানুষের এই প্রবণতা উপলব্ধি করেন, সেই অনুযায়ী যদি নীতি নির্ধারণ করেন, তাহলে দেশের জন্য ভালো কিছু হওয়া সম্ভব।

আমাদের দেশটা আয়তনে ছোট কিন্তু জনসংখ্যায় বড়। এখানে সম্পদের জন্য, বিশেষ করে সমাজের নিম্নস্তরে একটা তীব্র প্রতিযোগিতা হয়। বড় আকারে যারা সম্পদ করেছেন, তাদের মধ্যেও একটা বড় প্রতিযোগিতা আছে। এই অভ্যুত্থানের মতো আরেকটি অভ্যুত্থান হওয়া সম্ভব কিনা এমন প্রশ্ন অনেকেই তুলতে পারে। ব্যক্তিগতভাবে আমি মনে করি, একটা অভ্যুত্থানই শেষ কথা নয়, ভবিষ্যতে আরও অভ্যুত্থান হতে পারে। দশ বা পনেরো বছর পর নতুন একটি ইস্যুকে কেন্দ্র করে আবারও অভ্যুত্থানের সৃষ্টি হতে পারে। সবচেয়ে বড় কথা হচ্ছে, এখানে অভ্যুত্থান হচ্ছে, যুগে যুগে মানুষ জেগে উঠছে, কিন্তু প্রচলিত সমাজব্যবস্থার ভিত এতো শক্ত যে তা টিকে থাকছে নানা ভাবে, নানা ব্যবস্থায়। সেই দিনই এই দেশের মানুষের মুক্তি সম্ভব হবে, সত্যিকার স্বাধীনতা অর্জন সম্ভব হবে, যেদিন এ সমাজের সনাতনী বুননটাকে ছিন্ন করে নতুনভাবে বুননের চর্চা শুরু করতে পারব। তখনই সমাজটা চরিত্রগতভাবে, গুণগতভাবে পরিবর্তিত হয়ে একটা সত্যিকারের সভ্য সমাজে পরিবর্তিত হবে। ❖

অর্থনীতিবিদ
রাজনৈতিক বিশ্লেষক

সেন্ট্রাল ডিপজিটরি বাংলাদেশ লিমিটেড

ফ্রি এসএমএস এলার্ট ও ই-মেইল নোটিফিকেশন

নিম্নবর্ণিত তথ্য সমূহ এসএমএস ও ই-মেইল-এর মাধ্যমে সিডিবিএল সরাসরি বিও হিসাবধরীকে বিনামূল্যে নিয়মিত অবহিত করছে:

- বিও হিসাবে ডেবিট/ক্রেডিট-এর তথ্য
- বিও হিসাবের মাসিক বিবরনী
- বিও হিসাব খোলা ও বন্ধ করন
- বিও হিসাবধারীর নাম পরিবর্তন
- বিও হিসাবের ব্যাংক হিসাব নম্বর পরিবর্তন
- বিও হিসাবের ব্যাংকের নাম পরিবর্তন
- বিও হিসারের মোবাইল নম্বর পরিবর্তন
- বিও হিসারের ইমেল ঠিকানা পরিবর্তন

এ সেবা পেতে বিও হিসাবধারীগণ নিজ নিজ ডিপি মাধ্যমে সিডিবিএল-এর ডেটাবেইজে, মোবাইল নম্বর ও ই- মেইল ঠিকানা হালনাগাদ করুন।

অনলাইন ব্যালান্স ইনকোয়ারী

নিম্নবর্ণিত তথ্য সসমূহ সেন্ট্রাল ডিপজিটরি বাংলাদেশ লিমিটেড (সিডিবিএল)-এর ওয়েব সাইট থেকে বিও হিসাবধারীগন বিশ্বের যেকোন প্রান্ত থেকে যেকোন সময় জানতে পারেন:

বিও হিসাবে ধারনকৃত সিকিউরিটিজ এর পরিমান পূর্ববর্তী দিনের সমাপনী মূল্যে এর মূল্যমান বিও হিসারের বিগত এক মাসের বিবরনী

এ সেবা পেতে সিডিবিএল-এর ওয়েবসাইট : www.cdbl.com.bd- এর মাধ্যমে রেজিস্ট্রেশন করুন

ডিএসই টাওয়ার (লেভেল-৫), বাড়ী# ৪৬, রোড#২১, নিকুঞ্জ-২, ঢাকা-১২২৯
Telephone: +88-02-41040386-95, Fax: +88-02-41040385, E-mail: info@cdbl.com.bd

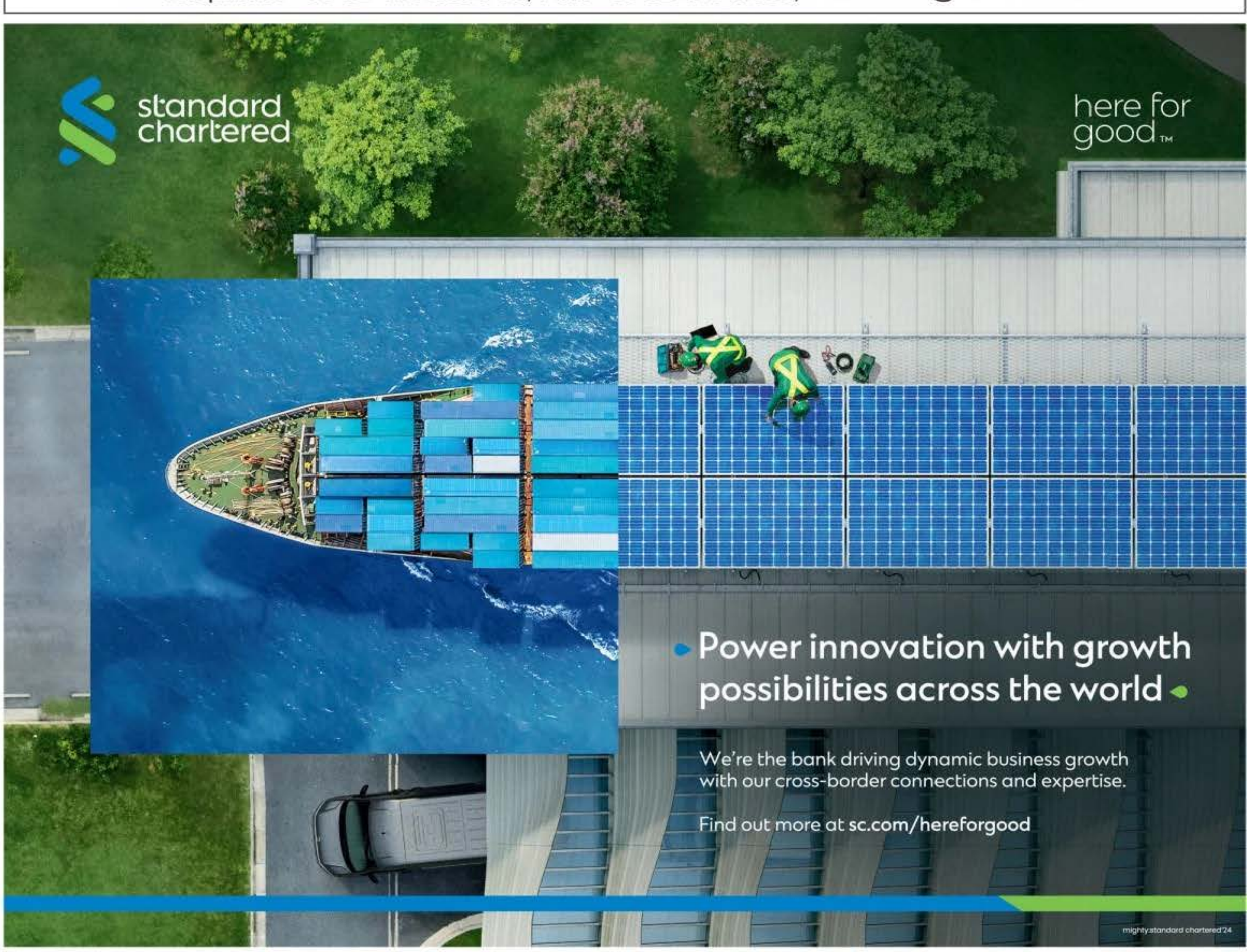

গণঅভ্যুত্থান ও কয়েকটি প্রসঙ্গ

ফয়জুল লতিফ চৌধুরী

এ বছর ৫ আগস্ট ছাত্র-জনতার সফল অভ্যুত্থানের মধ্য দিয়ে সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিতভাবে শেখ হাসিনার স্বৈরাচারী সরকারের পতন হয়েছে। প্রাণভয়ে একনায়ক দেশত্যাগে বাধ্য হয়েছে। গুম, খুন ও মামলার ভয়ে কুঁকড়ে যাওয়া মানুষের মুক্তি ঘটেছে। পুলিশের রাইফেল স্তব্ধ করে দেওয়া হয়েছে। ১৯৭১-এর ১৬ ডিসেম্বরের পর দ্বিতীয়বারের মতো বাংলাদেশের মানুষ মুক্তির স্বাদ আস্বাদন করেছে। নতুন বাংলাদেশ গড়ে তুলবার প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হয়েছে। স্বীকৃত হয়েছে যে রাষ্ট্রের ব্যাপক সংস্কার দরকার। স্বীকৃত হয়েছে যে নতুন করে সংবিধান প্রণয়ন করা জরুরি। অনুভূত হয়েছে বাংলাদেশের রাজনৈতিক বন্দোবস্তে এমন কোনো সমস্যা রয়েছে, যার জন্য টেকসই শাসনব্যবস্থা গড়ে উঠছে না।

গণতন্ত্রই যে পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ শাসনব্যবস্থা তা নিশ্চিত করে বলা যায় না। কিন্তু আধুনিক মানুষ আজ অবধি গণতন্ত্রের চেয়ে শ্রেষ্ঠতর কোনো শাসনব্যবস্থা উদ্ভাবন করে উঠতে পারেনি। তাই নির্বাচনভিত্তিক গণতন্ত্রই জনগণের অভীষ্ট। কিন্তু আজ তাদের প্রশ্ন: কেন সুষ্ঠু নির্বাচনের মধ্য দিয়ে গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থার ধারাবাহিকতা রক্ষা করা সম্ভব হচ্ছে না? কেন গণতন্ত্র থেকে গণতন্ত্রে উত্তরণ সম্ভবপর হচ্ছে না? কোন কোন শর্ত পূরণ করে গণতন্ত্র থেকে স্বৈরতন্ত্রের উদ্ভব হচ্ছে ইত্যাদি। ১৯৭৫ সালের জানুয়ারি মাসে যখন তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী শেখ মুজিবুর রহমান সকল প্রকার রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডের সুযোগ রহিত করে বাকশালতন্ত্র কায়েম করলেন, তখন তিনি সংবিধান সংশোধনের মধ্য দিয়ে বাংলাদেশে গণতন্ত্রের কবর রচনা করেছিলেন। রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমানের কর্মকালের পর বিচারপতি সাত্তারের কর্মকালে সেনাবাহিনীপ্রধান জেনারেল এরশাদ অস্ত্রের জোরে রাষ্ট্রক্ষমতা দখল করে গণতন্ত্র রহিত করেন। গণতন্ত্র তৃতীয়বার বাধাগ্রস্ত হয় ২০০৭ সালে যখন তত্ত্বাবধায়ক সরকার যথাসময়ে নির্বাচন অনুষ্ঠানের পরিবর্তে অন্যান্য কর্মকাণ্ডে বিশেষ করে প্রথমে মাইনাস টু এবং পরে মাইনাস ওয়ান লক্ষ্য বাস্তবায়নের জন্য সক্রিয় হয়ে ওঠে। আর শেখ হাসিনার স্বৈরতন্ত্র তো গতকালের ঘটনা; যা ব্যাখ্যার অপেক্ষা রাখে না।

বাংলাদেশের অভিজ্ঞতার আলোকে বলা যায়, গণতন্ত্র বিঘ্নিত হয় প্রধানত ব্যক্তির ক্ষমতালিপ্সার কারণে। আমার দৃঢ় বিশ্বাস: ২০০৮ সালের নির্বাচনে জিতে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ যদি শেখ হাসিনার পরিবর্তে অন্য কোনো নেতাকে প্রধানমন্ত্রী নির্বাচিত করত তবে আজ বাংলাদেশ এবং আওয়ামী লীগ এ রকম দুর্দশায় নিপতিত হতো না।

২.

অভ্যুত্থান-পরবর্তী বাংলাদেশ পরিচালিত হচ্ছে অন্তর্বর্তী সরকারের তত্ত্বাবধানে। ইতোমধ্যে প্রায় চার মাস অতিক্রান্ত হয়েছে। আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি এখনও সন্তোষজনক পর্যায়ে উন্নীত করা যায়নি। পুলিশ প্রশাসনের আভ্যন্তরিক সমস্যা নিরসনে সময় লাগবে। অন্যদিকে জিনিসপত্রের মূল্যবৃদ্ধি অব্যাহত রয়েছে। কোনো জনসমীক্ষা না-হলেও সোশ্যাল মিডিয়ায় প্রকাশিত জনসাধারণের অভিমত পর্যালোচনা করে বোঝা যায়, বেহাল আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি ও জিনিসপত্রের মূল্যবৃদ্ধি নিয়ে মানুষ অসন্তুষ্ট। তাদের অসন্তোষ বাতিল করে দেওয়া যায় না। সুতরাং তাদের প্রতি আমাদের নিখাদ সমবেদনা রয়েছে। সাধারণত সরকারকে একটিমাত্র কাজ করতে হয় আর সেটি হচ্ছে রাষ্ট্র পরিচালনা। অন্তর্বর্তী সরকারকে একযোগে তিন-চারটি কাজ করতে হচ্ছে, যার একটি হচ্ছে রাজনৈতিক ব্যবস্থাপনা; দ্বিতীয়ত রাষ্ট্র পরিচালনা, তৃতীয়ত প্রশাসনিক সংস্কার এবং চতুর্থটি হচ্ছে বিগত স্বৈরাচারী সরকারের অপকর্মগুলো নস্যাৎ করা। এতগুলো কাজ দ্রুতবেগে করার মতো যথেষ্ট লোকবল তো আমাদের নেই। সুতরাং রাষ্ট্র পরিচালনার ক্ষেত্রে ঘাটতি থাকতে পারে। উপদেষ্টামণ্ডলী সম্প্রসারণ করে এবং সচিব ও মহাপরিচালক পদে অভিজ্ঞ ও নেতৃত্বের গুণাবলিসম্পন্ন কর্মকর্তাদের পদস্থ করে এই ঘাটতি অনেকাংশে দূর করা সম্ভব। অন্তর্বর্তীকালীন সরকারে ছাত্র ও তরুণদের উপস্থিতি, ইংরেজিতে যাকে বলে একপ্রকার 'প্যারাডাইম শিফট'। ফলে তরুণরা তাদের সম্মিলিত কার্যক্রমের শক্তিই কেবল অনুভব করেনি, সমাজে তাদের গ্রহণযোগ্যতা নতুন করে উপলব্ধি করেছে। এর ফলে তাদের অনেকেই নিজ আগ্রহে রাজনীতিমুখী হবে। শিক্ষাঙ্গনে দলীয় ছাত্র সংগঠনের পরিবর্তে নির্দলীয় ছাত্র সংগঠনের মধ্য দিয়ে নতুন নেতৃত্ব ও শুভ-রাজনীতির অঙ্কুরোদ্গম হতে পারে। তাই বলে তরুণরা দেশের ঐতিহ্যবাহী রাজনৈতিক ধারার বিকল্প হিসেবে আবির্ভূত হবে, এ রকম কোনো ইঙ্গিত দৃশ্যমান নয়। তবে সকল রাজনৈতিক দল তরুণদের সম্মিলিত শক্তি ও উদ্যমকে দেশ গঠনের কাজে ব্যবহার করতে পারে। যারা প্রবীণ, তাদের উচিত হবে তরুণদের জন্য স্থান ছেড়ে দেওয়া। এর প্রথম শর্ত হলো, উত্তর-প্রজন্মকে যথাযোগ্যভাবে গড়ে তোলা।

৩.

মানুষ অনুধাবন করেছে রাষ্ট্রের সংস্কার দরকার। কিন্তু অভীষ্ট সংস্কারের রূপরেখা এখনও সুস্পষ্ট নয়। সংবিধান সংশোধন, পুনর্লিখন বা নতুনভাবে প্রণয়ন নিয়ে বিতর্ক শুরু হয়েছে। এ প্রসঙ্গে স্মরণ করা যায়, ১৯৭২ সালের ৪ নভেম্বর তারিখে বাংলাদেশের গণপরিষদে প্রথম সংবিধান অনুমোদিত ও গৃহীত হয়। ১৯৭৩ সালের ১৫ জুলাই সংবিধান প্রথমবারের মতো সংশোধন করা হয়েছিল। এরপর ৮ জুলাই, ২০১৮ অবধি আরও ষোলোবার সংবিধান সংশোধন করা হয়েছে। সংবিধানকে আইনের মতো ব্যবহার করা হয়েছে। সংবিধানে এত কাটাছেঁড়া হয়েছে যে তা নতুন করে লিখলে পাঠকের জন্য সুবিধা হবে। কিন্তু বড় কথা, নতুন সংবিধানে এমতরূপ বিধানাবলি সংযোজন করা দরকার যাতে নাগরিক অধিকার নিশ্চিত করা যায়, যাতে রাষ্ট্র অন্ধ দৈত্যের মতো ক্ষমতাধর না হয়ে ওঠে। সংবিধানের দোহাই দিয়ে সংসদ বা সরকার যেন ক্ষমতার অপব্যবহার করতে না পারে সেই লক্ষ্য নিয়ে সংবিধানে মৌলিক পরিবর্তন করা দরকার। এ রকম একটি সংবিধান দরকার, যা বারবার কাটাছেঁড়ার প্রয়োজন হবে না। মুক্তিযুদ্ধ শুরু হয়ে যাওয়ার পর ১৯৭১ সালের ১০ এপ্রিল বাংলাদেশের স্বাধীনতার ঘোষণাপত্র গ্রহণ করা হয়েছিল। এ ঘোষণাপত্রে বলা হয়েছিল বাংলাদেশের জনগণের জন্য সাম্য, মানবিক মর্যাদা ও সামাজিক ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা করার উদ্দেশ্যে একটি সার্বভৌম রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করা হলো। নতুন সংবিধানে স্বাধীনতার ঘোষণাপত্রের স্পিরিট যেন প্রতিফলিত হয় সেদিকে আমাদের নজর থাকতে হবে। কয়েক বছর আগে আমি একটি উপন্যাস লিখেছিলাম হুমায়ূন আহমেদকে নিয়ে। আমি কল্পনা করেছিলাম তিনি বেঁচে আছেন ও ২০২৫ সালে নোবেল পুরস্কার অর্জন করেছেন। নোবেল বিজয়ীদের সুইডেনে গিয়ে একটি বক্তৃতা দিতে হয়। হুমায়ূন আহমেদের কাল্পনিক বক্তৃতায় ছিল: একটি কার্যকর সংবিধানের দুটি মাত্র নীতিবাক্যই যথেষ্ট। কী এই নীতিবাক্য?

প্রথম নীতিবাক্য: আমি আপনার দেহে আঘাত করব না, আপনার জীবন সংশয় হয়– এমন কোনো কাজ করব না। আপনিও আমার দেহে আঘাত করবেন না, আমার জীবন সংশয় হয়– এমন কোনো কাজ করবেন না।

দ্বিতীয় নীতিবাক্য: আমি আপনার ধনসম্পদ অর্থবিত্ত ছিনিয়ে নেব না বা ছিনিয়ে নেওয়ার চেষ্টা করব না– আপনিও আমার ধনসম্পদ ছিনিয়ে নেবেন না বা নেওয়ার চেষ্টা করবেন না। আমার প্রস্তাব "প্রোপার্টি রাইটস" নিয়ে নতুন সংবিধানে গুরুত্বারোপ করা উচিত। আইনস্থানীয় বিষয়গুলো সংবিধান থেকে বাদ দিয়ে সংবিধানের বহরও ছোট করে আনা সম্ভব।

৪.

টেকসই গণতন্ত্রের স্বার্থে পেশিশক্তি ও কালোটাকা-নির্ভর রাজনীতি থেকে বের হয়ে আসতে হবে এবং নির্বাচন তাৎপর্যপূর্ণ করে তুলতে হবে। নির্বাচন হবে সর্বতোভাবে সুষ্ঠু। এ রকম একটি জবাবদিহিমূলক পরিবেশ গঠন করতে হবে যে দলীয় মার্কার জোরে নয়, বরং ব্যক্তিগত কর্মকাণ্ডের ভিত্তিতে একজন রাজনৈতিক নেতা জনপ্রতিনিধি হিসেবে নির্বাচিত হবেন। জবাবদিহিমূলক পরিবেশে রাজনীতিবিদরা জনমুখাপেক্ষী থাকবেন। তারা জীবিকার জন্য রাজনীতি করবেন না। জনগণের টাকা লুটপাট করার জন্য রাজনীতি করবেন না। তাদের ক্রিমিনাল রেকর্ড থাকবে না। তাদের দুর্নীতির রেকর্ড থাকবে না। অদক্ষতা ও ব্যর্থতা প্রমাণিত হলে মন্ত্রীরা স্ব-উদ্যোগে পদত্যাগ করবেন। এ কথা ঠিক যে অতীত অভিজ্ঞতার নিরিখে কোনো কোনো রাজনৈতিক দলের গ্রহণযোগ্যতা ব্যাপকভাবে হ্রাস পেয়েছে। এবং আরও হ্রাস পাবে যখন তাদের অপকর্মের আরও তথ্য সপ্রমাণ ফাঁস হতে থাকবে। সেটা ভিন্ন কথা। সাধারণভাবে বলা যায় যে, বাংলাদেশের মানুষের চরিত্রে রাজনীতি এমনভাবে অনুপ্রবিষ্ট যে তারা অদূরভবিষ্যতে রাজনীতিবিমুখ হবে বলে মনে হয় না। এ দেশে নির্বাচন হয় উৎসবমুখর পরিবেশে। মানুষ নির্বাচনী কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণ করতে ভালোবাসে। ভোট দিতে ভালোবাসে। ২০১৪, ২০১৮ ও ২০২৩-এর নির্বাচন তাদের হতাশ করেছিল। কারণ, তারা ভোট দিতে পারেনি। ২০২৭ সালের নির্বাচন অবাধ ও নিরপেক্ষ পরিবেশে হলে আশা করি ভোটারদের অংশগ্রহণ ৭০-৮০ শতাংশে পৌঁছাবে।

৫.

অন্তর্বর্তী সরকারের কাছে বিএনপি দ্রুত নির্বাচন দেওয়ার দাবি জানিয়েছে। আমার ধারণা, বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল এবং অন্য দলগুলো অন্তর্বর্তী সরকারের সঙ্গে সহযোগিতা করার জন্য দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। দ্রুত নির্বাচনের দাবি একটি কৌশলগত পদক্ষেপ বলে মনে হয়: নিছক জানান দেওয়া যে আমরা আছি এবং সুষ্ঠু পরিবেশে নির্বাচনের জন্য অপেক্ষা করছি। এই দাবি অন্তর্বর্তী সরকারের বিষয়ে অসন্তোষের ইঙ্গিত দেয় না। সংস্কার এবং পুনর্গঠনের সুযোগ অন্তর্বর্তীকালীন সরকারকে দিতেই হবে। প্রয়োজনীয় সামাজিক ও প্রশাসনিক সংস্কার ছাড়া পরবর্তী নির্বাচন অগ্রহণযোগ্য হয়ে পড়তে পারে। বড় দলগুলো নিশ্চয়ই তা চাইবে না। তবে সব সংস্কার করে ফেলার আকাঙ্ক্ষা হবে উচ্চাভিলাষী। তাতে নির্বাচন দিতে তিন-চার বছর লেগে যেতে পারে। সরকার পরিচালনার জন্য গণতন্ত্রমনা রাজনৈতিক দলই উপযুক্ত। এ মুহূর্তে আওয়ামী লীগের অস্তিত্ব নেই বললে অতিশয়োক্তি হয় না। জাতীয় পার্টির অস্তিত্ব আছে কিনা তা স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে না। বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল-বিএনপি এখন দেশের বৃহত্তম রাজনৈতিক দল। কিন্তু লক্ষণীয়, বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী বেশ সরব হয়ে উঠেছে। নির্বাচন ও সংস্কারসহ নানা বিষয়ে এ দুই দলের মধ্যে মতানৈক্যও লক্ষ করা যাচ্ছে। রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে আদর্শিক এবং কৌশলগত মতদ্বৈধতা অস্বাভাবিক কিছু নয়। এরা দুটি ভিন্ন দল এবং তাদের দৃষ্টিভঙ্গি বহুলাংশে পৃথক। জামায়াত সমানুপাতিক হারে সংসদ সদস্য বরাদ্দের যে প্রস্তাব দিয়েছে তা বাংলাদেশের মানুষ গ্রহণ করবে বলে মনে হয় না। এজন্য জামায়াতে ইসলামীকে দোষ দেওয়া যায় না। নতুন পদ্ধতি প্রস্তাব করার অধিকার তাদের রয়েছে। কিন্তু জামায়াতে ইসলামীকে অনুধাবন করতে হবে যে ১৯৯০ সাল থেকে তারা একাধিকবার ভয়ানক কৌশলগত ভুল করেছে; যার জন্য তাদের দলগতভাবে অনেক ক্ষতির সম্মুখীন হতে হয়েছে। ১৯৯৩ সাল থেকে শুরু করে বিএনপির পরিবর্তে আওয়ামী লীগকে কান্ডারি হিসেবে গ্রহণ করা জামায়াতে ইসলামীর জন্য মারাত্মক ভুল পদক্ষেপ ছিল। পরবর্তীকালেও তারা বিএনপির বিরুদ্ধে অবস্থান নিয়ে নিজেদের বিপদ ডেকে এনেছে।

জামায়াতে ইসলামীকে আরও অনুধাবন করতে হবে বাংলাদেশ মুসলমান-প্রধান দেশ বটে এবং এও সত্য যে মুসলমানদের মধ্যে ধার্মিকতা বৃদ্ধি পেয়েছে; অন্যদিকে বাস্তব এই যে এ দেশের মানুষ ধর্মপরায়ণ হলেও ধর্মভিত্তিক রাজনীতিকে সমর্থন করতে শেখেনি। জামায়াতে ইসলামী হয়তো কখনও জনমতের ভিত্তিতে ক্ষমতায় আসবে। সে সময় এখনও আসেনি।

প্রশ্ন উঠেছে পরবর্তী নির্বাচনে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ অংশগ্রহণ করতে পারবে কিনা। ১৯৭৫ সালের ২৫ জানুয়ারি তৎকালীন আওয়ামী লীগ সরকার সংবিধান সংশোধন করে দেশে বিরোধীদলীয় রাজনীতি নিষিদ্ধ করেছিল। এখনকার অবস্থা সে রকম নয়। বিদ্যমান আইনি কাঠামোতে বাংলাদেশের প্রতিটি বৈধ রাজনৈতিক দল রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড পরিচালনা এবং নির্বাচনে অংশগ্রহণ করার অধিকার রাখে। এ সূত্রে স্মরণ করা যেতে পারে যে, ১৯৭৫ সালে আকস্মিকভাবে আওয়ামী লীগ সরকারের পতন হয়। ১৯৭৯ সালের ১৮ ফেব্রুয়ারি জেনারেল জিয়াউর রহমানের আমলে দেশের দ্বিতীয় জাতীয় সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। প্রায় ৫২ শতাংশ ভোটার ভোট দিয়েছিলেন। এ নির্বাচনে আওয়ামী লীগ ২৪.৫৬ শতাংশ ভোট ও ৩৯টি আসন লাভ করেছিল। ২০২৭-এর নির্বাচনে অংশ নিলে আওয়ামী লীগ অন্তত ১০-১২ শতাংশ ভোট পাবে, এ রকম অনুমান অন্যায্য হবে না।

৬.

রাষ্ট্র হিসেবে আমাদের প্রধান দুর্বলতা হচ্ছে আমরা অর্থনৈতিকভাবে দরিদ্র একটি দেশ এবং ভৌগোলিক আয়তনে ছোট; যার তিনদিকেই ভারত। গ্লোবালাইজেশনের পরে আমরা বিশ্ব অর্থনীতির সঙ্গে অঙ্গীভূত হয়েছি বটে কিন্তু এর মধ্য দিয়ে অন্য দেশের ওপর আমাদের মুখাপেক্ষিতা বৃদ্ধি পেয়েছে। তাছাড়া আমরা এখনও শিখিনি যে বিভিন্ন দেশের সঙ্গে কীভাবে স্বার্থের ভারসাম্য বজায় রেখে চলা যায়। দ্বিপক্ষীয় সম্পর্ক রক্ষা করেও কী করে বহুপক্ষীয় পর্যায়ে পজিটিভভাবে সক্রিয় থাকা যায় তা আমাদের শিখতে হবে। "সবার সঙ্গে বন্ধুত্ব, কারও সঙ্গে শত্রুতা নয়"– এই পররাষ্ট্রনীতি এখন অচল বলেই আমি মনে করি। এই পররাষ্ট্রনীতি আদর্শস্থানীয় বটে কিন্তু এটা আমাদের যথাযথ আন্তর্জাতিক কৌশল নিরূপণে সাহায্য করে না। সৌভাগ্যের কথা, বাংলাদেশের ওপর দাদাগিরি ফলাতে চাওয়া দেশের সংখ্যা বেশি নয়। এতে কোনো সন্দেহ নেই আমাদের গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা গত ১৫ বছরে দুর্বল হয়ে গেছে। আমরা নিজেরাই ক্ষমতা আঁকড়ে থাকার জন্য নির্বাচনের ওপর ভরসা না করে, জনমতের ওপর ভরসা না করে, বরং অন্য দেশের ওপর আমরা নির্ভর করেছি। এটাই আমাদের রাজনীতির কঠিন দুর্বলতা। বাংলাদেশের প্রতিটি রাজনৈতিক শক্তিকে অবশ্যই আভ্যন্তরিক জনমতের ওপর নির্ভর করতে হবে এবং সুষ্ঠু নির্বাচনের ফলাফলের ওপর শতভাগ আস্থা রাখতে হবে। জনগণকে অসম্মান করে নির্বাচনবহির্ভূতভাবে ক্ষমতা আঁকড়ে থাকার যে নীতি আমরা ২০১৪ সাল থেকে অবলোকন করেছি তা পরিত্যাজ্য।

৭.

স্বৈরতন্ত্র থেকে গণতন্ত্রে উত্তরণের পথ মসৃণ নয়। এ পথ পিচ্ছিল এবং পা হড়কে যেতে পারে। শেখ মুজিবের স্বৈরতন্ত্রের বয়স ছিল কমবেশি ছয় মাস। কিন্তু শেখ হাসিনার স্বৈরতন্ত্রের বয়স ১৫ বছর। দীর্ঘস্থায়ী স্বৈরতন্ত্র সমাজকে কলুষিত করে ফেলে। সৃষ্টি করে স্বৈরতন্ত্রের বড় মাপের উত্তরাধিকার। স্বৈরতন্ত্রের মেয়াদ যত দীর্ঘ হয়, গণতন্ত্রে উত্তরণ ততই কঠিন হয়ে পড়ে। ১৯৯১ সালে অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের আয়োজনে যখন নির্বাচন হলো এবং ১৯৯৬ সালে যখন বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল নিজেদের স্বার্থ বিসর্জন দিয়ে তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থাকে সংবিধানের অন্তর্ভুক্ত করে নিল– তখন আমরা টেকসই গণতন্ত্রের ব্যাপারে আশাবাদী হয়ে উঠেছিলাম। তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে অনুষ্ঠিত ১৯৯৬ এবং ২০০১ সালের নির্বাচন আমাদের আশাবাদ বলীয়ান করেছিল। দুঃখের বিষয়, আওয়ামী লীগ সরকার সংবিধানের পঞ্চদশ সংশোধনীর মাধ্যমে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে নির্বাচনের প্রতিশ্রুতিময় ব্যবস্থাটি বাতিল করে দেয়। আমাদের রাজনীতির মূল সমস্যা হচ্ছে গণতন্ত্র থেকে গণতন্ত্রে উত্তরণ। আমাদের মূল ভয় হচ্ছে, গণতন্ত্র যেন স্বৈরতন্ত্র বা সামরিকতন্ত্রে পর্যবসিত না হয়। নতুন সংবিধানে নির্বাচনের জন্য তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থা যথাযথভাবে সংস্থাপিত হলে গণতন্ত্র থেকে গণতন্ত্রে উত্তরণ সহজ হবে বলে আমার দৃঢ় বিশ্বাস রয়েছে।

একই সঙ্গে সরকারের ক্ষমতা হ্রাসের জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতে হবে। সরকারপ্রধানের ক্ষমতায় ভারসাম্য আনতে হবে। সংবিধানের নবম সংশোধনীতে বলা হয়েছিল রাষ্ট্রপতি পদে কোনো ব্যক্তি পরপর দুই মেয়াদের দায়িত্ব পালন করতে পারবেন না। এ ধরনের বিধানের মাধ্যমে সরকারপ্রধানের ক্ষমতায়ও ভারসাম্য আনা সম্ভব। নতুন সংবিধান যথোচিতভাবে রচিত হলে দেশে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা সুস্থির হয়ে উঠবে বলে ন্যায্যত আশা করা যায়। ❖

কথাসাহিত্যিক
গবেষক

লাল বসন্তের ফুল ও পুরাণের গল্প

► ১৫ পৃষ্ঠার পর

অর্থাৎ বসন্ত এলে প্রাকৃতিকভাবেই লাল ফুল ফোটে। কিন্তু মানুষ সমাজে তরুণ থাকলেই পরিবর্তন ঘটে না। এ জন্য বিশেষভাবে প্রয়োজন হয় বিশেষ শক্তির তারুণ্যে। বিশেষ গুণাবলির তরুণ। এ তরুণকে তৈরি করতে হয় বা সে নিজেকে তৈরি করে। এ প্রস্তুতি সম্পন্ন হয় সমাজ, রাজনীতি, ইতিহাসের গভীর পাঠ গ্রহণের মাধ্যমে। এ পাঠ থেকে তৈরি হয় সচেতনতা। সে সচেতনতার সাথে যখন সাহসের সংযোগ ঘটে তখনও ঘটে বিস্ফোরণ। ইতিহাসে দেখা গেছে যারাই বিপ্লবী কোনো তত্ত্ব দিয়েছেন বা বিপ্লব করেছেন তাদের ছিল গভীর পড়াশোনা। নিজ দেশ নিজ মানুষ সম্পর্কে গভীর জ্ঞান। সেটা তাত্ত্বিক কার্ল মার্ক্স সম্পর্কে যেমন সত্যি, তেমনি সত্যি লেনিন সম্পর্কে। সত্যি বিপ্লবী চে সম্পর্কে। বিশ্বাসীরা মনে করেন নবী-রাসুলরা যারা সমাজে পরিবর্তন আনতেন স্বয়ং আল্লাহই তাদের সে গভীর জ্ঞানদান করতেন।

কিন্তু ইতিহাস বলছে, কোনো বিপ্লব বা পরিবর্তনটি দীর্ঘস্থায়ী হয়নি। মানুষ বিপ্লবের আদর্শ থেকে সরে গেছে। পথভ্রষ্ট হয়েছে, বিপ্লব বা পরিবর্তন স্থায়ী হয়নি। প্রাচীন ও মধ্যযুগের মানুষ যেমন বারবার ধর্ম থেকে বিচ্যুত হয়েছে, তেমনি মানুষের বিপ্লবী তত্ত্ব থেকেও বারবার সরে গেছে। পৃথিবীতে সমাজতন্ত্র টেকেনি। টেকেনি আরব বসন্ত। আরবে পরিস্থিতি বরং খারাপ হয়েছে।

বাংলাদেশে এ বছর ছাত্র অভ্যুত্থান ঘটেছে। অনেকে এটিকে বিপ্লব হিসেবেও অভিহিত করছেন। এ অভ্যুত্থান বা বিপ্লবের মাত্র কয়েক মাস অতিবাহিত হয়েছে। কিন্তু ইতোমধ্যে অধ্যাপক সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী ও সলিমুল্লাহ খানের মতো পণ্ডিতজনরা এটি ব্যর্থ হয়েছে বলে মতামত প্রকাশ করেছেন। অবশ্য এ বিষয়ে আমাদের মতামত হচ্ছে, চূড়ান্ত মতামত দেওয়ার সময় এখনও আসেনি। তবে প্রথাগত রাজনীতির হাতেই যে আবার ক্ষমতা যাবে, এমনটা বোঝা যাচ্ছে। এর মধ্যে সংস্কার কতটুকু করা সম্ভব হবে তাও অনিশ্চিত। মানুষ ইতোমধ্যে অসহিষ্ণু হয়ে উঠেছে। বিশেষত আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি আর দ্রব্যমূল্য ইস্যুতে। ১৯৭১ সালে যে পরিবর্তনের আকাঙ্ক্ষা নিয়ে এ দেশের মানুষ প্রাণ দিয়েছিল তা বিগত অর্ধ শতাব্দীতে পূরণ হয়নি। পূরণ হয়নি নব্বইয়ের গণআন্দোলনের আশাও।

তথাপি তরুণরা বদলায়। বদলানোর চেষ্টা করে। কিন্তু দেখা গেছে সে বদলটি থাকে না। আগের অবস্থানে চলে যায়। তাই বলে তরুণরা থেমে থাকে না। প্রজন্মের পর প্রজন্ম বারবার বদলানোর চেষ্টা করে। করে বিদ্রোহ বিপ্লব। সমাজে নিয়ে আসে বসন্ত। প্রকৃতিও যেমনটি করে। বসন্তের পর হয়তো শীত আবার চলে আসে। তাই বলে তরুণদের পরাজয় ঘটে না। ইতিহাস তাদের মনে রাখে। তারা যুগের পর যুগ টিকে থাকে মানুষের মনে। যেমন টিকে আছে পৌরাণিক গল্পের চরিত্রটি। অনেকের জানা গল্পটি একই সাথে যেমন হতাশাজনক, তেমনই প্রেরণাদায়কও।

২.

ভারতীয় দেবতারা যেমন থাকেন হিমালয়ের চূড়ায়, তেমনি গ্রিক দেবতারা থাকতেন অলিম্পাস পাহাড়ের চূড়ায়। প্রাচীনকালের এ দেবতাদের গল্প নানা সময়ে মানব সম্প্রদায়ে প্রাসঙ্গিক হয়ে ওঠে। এর মধ্যে সবচেয়ে আলোচিত পৌরাণিক কাহিনিটি হচ্ছে দেবতাপুত্র সিসিফাসকে নিয়ে। গ্রিক চরিত্র সিসিফাসের অবাধ্যতার জন্য দেবতারা তার ওপর রুষ্ট হয়েছিলেন। এ জন্য তার জন্য তারা এক যন্ত্রণাদায়ক শাস্তির ব্যবস্থা করেছিলেন। তারা তার কাঁধে তুলে দিয়েছিলেন এক ভারী পাথর। শর্ত ছিল সিসিফাস পাথরটি পাহাড়ের চূড়ায় তুলে রাখতে পারলে তার মুক্তি ঘটবে। সিসিফাস সারাদিন কষ্ট করে পাথরটি কাঁধে তুলে পাহাড়ের চূড়ায় তুলতেন। কিন্তু রাতেই পাথরটি গড়িয়ে আবার পাহাড়ের নিচে চলে আসত। সিসিফাস পরদিন আবার তুলতেন। পাথরটি আবার গড়িয়ে নিচে চলে আসত। এভাবে ফলহীনভাবে অনন্তকাল ধরে চলছে। বলা হয়ে থাকে পশ্চিমের এবসার্ড তত্ত্বের এটি একটি অন্যতম উৎস। পৌরাণিক এ গল্পটি সাহিত্যে দর্শনে বারবার এসেছে। গল্পটি হোমারের গ্রিক কাব্যে আছে। আছে রোমান কবি অভিডের কাব্যে। পরবর্তী সময়ে তাত্ত্বিক, দার্শনিকরা মিথটির নানা ব্যাখ্যা দিয়েছেন। কেউ কেউ বলেছেন গল্পটি মূলত সূর্যদেবতার। সূর্যের ক্ষেত্রেও একই ঘটনা ঘটে। প্রতিদিন পৃথিবীকে আলো করার জন্য সূর্যকে কষ্ট করে পৃথিবীর আকাশে তোলা হয়। কিন্তু সন্ধ্যা হলেই সে আবার নিচে গড়িয়ে চলে যায়। পৃথিবীতে আলো স্থায়ী হয় না। গল্পটির সবচেয়ে বড় ব্যাখ্যা দিয়েছেন আলবেয়ার কামু। মিথটি নিয়ে ১৯৪২ সালে তিনি 'মিথ অব সিসিফাস' নামে ১২০ পৃষ্ঠার একটি দীর্ঘ প্রবন্ধ রচনা করেন। প্রবন্ধটিতে তিনি মূলত এবসার্ড তত্ত্ব তুলে ধরেন। কিন্তু অন্তিমে ব্যাখ্যা করেন গল্পটির আশাবাদী দিক। তাঁর মতে, সিসিফাসটি যদি কাজটি আনন্দের সাথে প্রতিদিন করতে থাকে তাহলে তা তার হৃদয়কে আনন্দে ভরিয়ে রাখতে তা যথেষ্ট। আর তখনই সিসিফাসকে একজন সফল হিসেবে সহজেই কল্পনা করা যায়। গল্পটির ব্যাখ্যা আমরা যা-ই করি না কেন, কিন্তু গল্পটিতে এটা দেখতে পাই যে, পাথরটি আবার নেমে আসবে এই চিন্তায় সিসিফাস তোলার কাজটি থামায় না। যেমন বসন্তের পর শীত আবার আসবে– এই ভয়ে প্রকৃতিতে বসন্ত আসা কখনও বন্ধ হয় না। বসন্ত হারিয়ে গেলেও মানুষ বসন্তের ঝরে যাওয়া লাল ফুলগুলো মনে রাখে। আর প্রকৃতিতে বসন্তও বারবার ফিরে আসে। ❖

কবি
গবেষক

তুমি কেমন তোমার বুকে সাচ্চা

► ১৫ পৃষ্ঠার পর

এইভাবে প্রজন্ম থেকে প্রজন্ম অন্যায়ের বিরুদ্ধে, স্বৈরাচারের বিরুদ্ধে অকুতোভয়ে প্রতিরোধ করেছে, প্রতিবাদ করেছে, আত্মদান করেছে মানুষের সামগ্রিক মুক্তির আশায়। তারা অগ্রজ কি অনুজ– সবাই নতুন প্রজন্ম।

এই ভূখণ্ডে, ব্রিটিশ শাসনামলে ভাবা যেত একজন কৃষক বাবার সন্তান লেখক হবে? ভাবতে পারার এই ধারণাও দিয়েছে নতুনেরা। প্রজন্ম থেকে প্রজন্ম পরম্পরায় ন্যায় প্রতিষ্ঠার জন্য, অন্যায়কে রুখে দিতে জীবন দিয়েছে। কিন্তু যারা রাষ্ট্রক্ষমতায় গিয়েছে, তারা ভুলে গেছে সেইসব শহীদানের কথা। তারা এড়িয়ে গেছে মানুষের মুক্তির কথা। আবার নতুন প্রজন্ম তা মনে করিয়ে দিতে পথে নেমেছে, রাজপথে নেমেছে, রক্ত দিয়েছে, জীবন দিয়েছে।

নতুন প্রজন্মের প্রধান শক্তি হচ্ছে সততা, যা আমি আমার বাবা-মায়ের কাছ থেকে পেয়েছি। নতুন প্রজন্ম যা করে, তার প্রধান শক্তি সততা। কিন্তু আমার দেখা এই সততা বেহাত হয়, অগ্রজদের স্বার্থপরতায়। শুধু তাই নয়, সততা এমনি এমনি আসে না। একটি ছড়াকবিতার কথা বলি–

একটা কথা কও তো দেখি / বুকের ভিতর ময়না পাখি
সবাই যখন হাত মেলায় / হাতের লেখায় জাতকেলায়
তুমি তখন করবেটা কী?
আচ্ছা,
একটা কথা কও তো দেখি / বুকের ভিতর ময়না পাখি
সবাই যখন চলছে পিছু / ধানের ক্ষেতে বুনছে লিচু
হাতের ভিতর পা গজায়; / তুমি কেমন তোমার বুকে সাচ্চা।'

এই সাচ্চা হওয়ার গল্পটা প্রতিটি বিপ্লবে বিপ্লবীদের কাছে জিজ্ঞাসা আসে। কারণ নতুন প্রজন্ম বুকে হাত দিয়ে বলতে পারে, আমি এমন আমার বুকে সাচ্চা। যেমন সাচ্চা ছিলেন রফিক, বরকত, সালামসহ ভাষার মিছিলে যোগ দেওয়া আরও কত নাম না-জানাদের নাম। যেমন সাচ্চা ছিল ১৯৬৯-এর গণঅভ্যুত্থানে আসাদসহ আরও কত বিপ্লবীদের রক্তাক্ত বুক। যেমন সাচ্চা ছিল একাত্তরে মুক্তির সংগ্রামে মা-বাবা-ভাই-বোনদের জানা ও অজানা নামগুলি। যেমন সাচ্চা ছিল '৯০-এর গণঅভ্যুত্থানের বিপ্লবীরা, যেমন রয়েছে আজও ১৯২৪-এর জুলাই-আগস্টের অকুতোভয় সাহসী সন্তানেরা। সে নাম অজস্র। একটি গানের কথা মনে পড়ছে– 'মুক্তির মন্দির সোপান তলে, কত প্রাণ হল বলিদান, লেখা আছে অশ্রুজলে।'

যখন একটি রাষ্ট্রে একজন নাগরিক ভিখিরি হয়ে বাংলামোটর মোড়ে আরেক নাগরিকের কাছে হাত বাড়ায়, যখন সেই রাষ্ট্রের প্রধানমন্ত্রী তাঁর পিয়নের প্রসঙ্গে বলে ৪০০ কোটি টাকা সঞ্চয়। তখন সেই দেশের প্রজন্ম এই প্রচলিত রাষ্ট্র ব্যবস্থাকে না করে দেয়। এই না করে দিতে পারার নাম বুকে হাত দিয়ে বলতে পারা– 'আমি এমন আমার বুকে সাচ্চা– এই সাচ্চারাই চিরকাল নতুন প্রজন্ম।' এই মুহূর্তে আমার মনে পড়ছে ফিলিস্তিনের প্রিয় কবি মাহমুদ দারবিশের একটি কবিতা, 'তুমি যখন সকালবেলা প্রাতরাশ করো, অন্তত মনে রেখো তোমার খাঁচার কবুতরটি খুদ কুঁড়ো পেয়েছে কিনা।' কিন্তু রাষ্ট্রক্ষমতায় গেলে তারা ভুলে যায় ন্যূনতম একজন ভিখিরির কথা। ভুলে যায় ভিখিরিও যে মানুষ ছিল। আহারে! এমন বেদনার রাষ্ট্র আমি খুব একটা দেখিনি!

বুকে হাত দিয়ে নিজেকে সাচ্চা বলতে পারার জন্য যুগের পর যুগ আসে, আমাদের সাচ্চা হওয়ার সুযোগ দেয়, নতুন প্রজন্ম সুযোগসন্ধানী নয়, তারা সাচ্চাটাকেই চায়। এই জন্য তারা বুক পেতে দেয়। এই সাচ্চা হওয়ার মানে একটি রাষ্ট্রে বৈষম্য ঘুচবে, কেউ খাবে কেউ খাবে না, তা হবে না। এই সাচ্চা হওয়ার মানে, 'তুমি শুয়ে র'বে তেতলার পরে আমরা রহিব নিচে,/ অথচ তোমারে দেবতা বলিব সে ভরসা আজ মিছে!' এই সাচ্চা হওয়ার মানে– 'অনেকেই তো খেতে পাচ্ছে/ কোর্মা পোলাউ গোস্ত/ কিন্তু ফুটপাতে যে শুয়ে রয়/ সে কেনো নয় আমার আপন দোস্ত!' এই সাচ্চা হওয়ার মানে দখল নয়, ভালোবেসে জয়। এই সাচ্চা হওয়ার মানে অন্যের হক মেরে সুইস ব্যাংকে টাকা জমানো নয়, এই সাচ্চা হওয়ার মানে ভিখিরির থালায় কয়েকটা সিকি আধুলির সঞ্চয় নয়। অপেক্ষাকৃত সাম্যের একটি সমাজ রচনাকারীরা এই রকম সাচ্চা হয়। তাদেরকে আমরা বিপ্লবী বলি, শহীদ বলি।

নতুন প্রজন্ম আমাদের বারংবার সাচ্চা হওয়ার শিক্ষা দেয়। এ জন্য প্রাণ বিসর্জন দেয়; তাদের রয়েছে তাজা রক্তের ঘোর। নতুন প্রজন্ম জানে কে উপনিবেশি রক্তের চোর। এই হচ্ছে আমার প্রিয় প্রিয়তম নতুন প্রজন্ম। 'তাদের সঙ্গে যাই আর তাদের কথাই লিখি/ উড়ন্ত এই কবি জন্ম প্রজন্ম প্রতীকী'!

দিন আসে রাত যায়, রাত আসে দিন যায়, নতুন প্রজন্ম আসে, নতুন প্রজন্ম আসে, নতুন প্রজন্ম চলে যায়, আবার নতুনেরা আসে– আমাকে শিখিয়ে দেয় নয়নাভিরাম এই ভোরের বাতাসে কী করে একটি সাচ্চা জীবনকে ভালোবেসে জীবনকে আরও মধুর করে তুলতে হয়। জয় নতুন প্রজন্মের জয়; নতুনেরা কখনও করে না বঞ্চনা। আরেকটি কবিতা দিয়ে নতুন প্রজন্মকে এইভাবে বরণ করতে চাই–

মনে আসছে যা যা / খোকা খুকু তাই চা
তেড়ে আসলে বেঁকে বসলে দমবি না
দমবি না/একার কথা চাস না।
মনে আসছে যা যা/খোকা খুকু তাই চা
তেড়ে আসলে বেঁকে বসলে দমবি না
দমবি না/তোরা যারা পাস না।
মনে আসছে যা যা/হৃদয় দিয়ে তাই চা
তেড়ে আসলে বেঁকে বসলে দমবি না
দমবি না/ সাপের বনে ফুল ফুটেছে হায়া। ❖

কবি

Global Heritage... Local Commitment

BRITANNIA

Britannia Label BD. Ltd.

Jaigir, Dollah Bazaar, Singair, Manikgonj, Bangladesh
Tel.: +88 02 9131445, 913144, Mobile : +88 0173010890
email : jamil.ahmed@britanniapackaging.com

UK Office : 22b Centurion Way,
Meridion business Park, Leicester, LE 19 1WH
Tel : 0116 281 5300, Fax : 0116 281 5301, ISDN : 0116 289 0614

- Digital & offset print
- Self Adhesive Sticker
- Heat Transfer
- Woven Labels
- Printed Fabric Labels
- Leather Patches and Labels

Spread over 70,000 sq feet on the outskirts of Dhaka, Britannia Label BD, carries forward the global excellence of the parent company Britannia Garment packaging in an integrated, compliant and sustainable complex to service bangladesh industry with the best of labels. Matching international standards in product and service, Britannia is the ideal partner for label solutions.

www.britanniapackaging.com

next · George. · BHS · &D · George. · Bonmarché · DEBENHAMS · Bm · Tammy · PEACOCKS · John Lewis · Bhs · max · RIVER ISLAND · PEACOCKS · Arcadia · DOROTHY PERKINS · BHS · John Lewis · Harvey Nichols · wallis · LEVI'S

WAI WAI
Instant Noodles

মাক ইট
স্যুপ ইট
লাক ইট

GREAT DELICIOUS

"Keeping pace with the growth of Bangladesh"

Industry Growth of A. K. Khan & Company Ltd.

Serving the nation since 1945

AKK
A.K.KHAN & COMPANY LTD.

A.K. Khan & Company Limited

Head Office : Batali Hills, Chittagong-4000, GPO Box No. 223, Bangladesh
Ph: (+880-31) 611050-2, Fax: (+880-31) 610596
Corporate Office : Bay s Galleria, 57-Gulshan Avenue, Gulshan-1, Dhaka-1212, Bangladesh
Ph: (+8802)8833510, 8833578, 8833540, Fax: (+8802)8831275
info@akkhan.com | www.akkhan.com

CITIZENS BANK
TODAY · TOMORROW · TOGETHER

Our Surveillance Rating Status in the Midst of 2 (Two) Years of Journey in the Banking and Financial Landscape

Surveillance Rating (CRISL) Year 2024	INTERPRETATION
Long Term **A-**	Banks rated in this category are adjudged to offer adequate safety for timely repayment of financial obligations. This level of rating indicates a corporate entity with an adequate credit profile. Risk factors are more variable and greater in periods of economic stress than those rated in the higher categories.
Short Term **ST-3**	**Good Grade** Good certainty of timely payment Liquidity factors and company fundamentals are sound. Although ongoing funding needs may enlarge total financing requirements, access to capital markets is good. Risk factors are small.
Outlook	Stable
Date of Rating	August 22, 2024
Valid Till	August 21, 2025

This is our impeccable commitment to excel in terms of financial fundamentals of our Bank by navigating the multifaceted challenges.

১৬ জুলাই, রংপুরে শহীদ আবু সাঈদ: প্রতিবাদের প্রতীক

তুমি কেমন তোমার বুকে সাচ্চা

আলফ্রেড খোকন

প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী আয়োজন

আমার বাবার এক বন্ধু ছিল, যে '৭১ সনে রূপসা নদীতে কয়েকশ টন রড ফেলেছিল। যুদ্ধ শেষে সেই রড তুলে বিক্রি করে লাভবান হওয়ার আশায়। এটা চুরি ছিল। বাবা জানতেন না যে তাঁর বন্ধু এই কর্ম করে গ্রামে চলে এসেছে। থানা থেকে দারোগা এলেন। গ্রামে ঢোকার পথেই আমাদের বাড়ি থাকায় পথে বাবার সঙ্গে দারোগার দেখা হয়ে গেল। তাঁর কাছে দারোগা যার খোঁজ নিচ্ছিলেন, সে ব্যক্তিটি বাবার শৈশবের বন্ধু। অত কিছু না বুঝে বন্ধুকে রক্ষা করার জন্য বাবা বলেছিলেন, এই মুহূর্তে সে কোথায় আছে আমি তো জানি না। দারোগা তাঁর টিম নিয়ে চলে গেলেন এই বলে যে, আবার আসবেন, আর যদি তার দেখা মেলে সে যেন গোপনে থানায় যোগাযোগ করে। সে কী কর্ম করে এসেছে বাবা তার কিছুই জানতেন না, শুধু জানতেন সে তাঁর বন্ধু।

বাবা গ্রামে ঢুকেই তাঁর বন্ধুর বাড়িতে যেয়ে ঘটনাটি বলে তাকে সতর্ক করে দিল সে যেন নিরাপদে অন্য কোথাও চলে যায়, বাবা ভেবেছিলেন তাঁর বন্ধু হয়তো বড় ধরনের কোনো লড়াই করছে মুক্তিযুদ্ধের জন্য!

আমার বাবা কৃষক ছিলেন, নিজের জমি ছিল, অন্যের জমি চাষ করেন, যাকে বলে বর্গাচাষি। মুক্তিযুদ্ধ শেষ হলো, তিনি বর্গাচাষিই রয়ে গেলেন। তাঁর চোরবন্ধ নদী থেকে রড তুলে বিক্রি করে ইন্ডাস্ট্রি করল। বাবা এসবের কিছুই জানতেন না। তিনি জানেন জমি কীভাবে চাষ করতে হয়, সে যার জমিই হোক।

যুদ্ধ শেষ হলো। যে যার মতো নিজের কাজে মনোনিবেশ করল। কয়েক বছর পর, বাবার সেই বন্ধু গ্রামে এল। ভোরবেলা আমাদের বাড়িতে এসে বারান্দায় বসল। মা চা-মুড়ি খেতে দিল। আমি বারান্দায় বসে পাঠ্যবই পড়ছিলাম। বাবাকে তাঁর বন্ধু বলছে, 'কিছুই তো করতে পারলি না। এবার কিছু জমিজমা কিনে নিজের জমি নিজে চাষ কর, আর কতকাল পরের জমি চাষ করবি।' বাবা উত্তর দিলেন– 'দেখ আমি বর্গাচাষি, জমি কেনার মতো কোনো টাকা-পয়সা নেই, আমার। ছেলেমেয়েরা পড়াশোনা করছে, সবাই ক্লাসে ফার্স্ট হয়, বেতন লাগে না। ওরাই আমার জমিজমা। ওরা লেখাপড়া করে সৎ মানুষ হবে, ওরাই আমার ভবিষ্যতের জমিজমা।' বাবার সেই বন্ধুটি চা শেষ না করেই নিঃশব্দে উঠে চলে গেল। বাবা অবশ্য পরে জানতে পেরেছিলেন তাঁর বন্ধুর চুরিকাহিনি। যার জন্য তাকে পুলিশ গ্রেপ্তার করতে এসেছিল, মুক্তিযুদ্ধের জন্য নয়।

মাস যেয়ে বছর আসে, বছর যেয়ে যুগ। এর মধ্যে আমাদের গ্রামের শিমুল ডাঙ্গার খালটি মজে গেছে, পুবের খণ্ডেশ্বর নদীটিও চর পড়ে স্রোতহীন, মজানদী হয়ে গেছে। পৃথিবীতে কত উত্থান-পতন হয়েছে! বাবা নেই অনেক বছর। মা নেই তারও আগে অনেক বছর। আমি এই বাবার ছেলে, তাঁর হাত ধরেই আমার পথচলা। আমি এই বাবা-মায়ের পরবর্তী প্রজন্ম।

এই গল্পটি বলার কারণ, যেমন করে ১৯৫২-তে অনেক বাবা-মায়ের সন্তান ভাষার জন্য লড়াই করেছে, প্রাণ দিয়েছে, আবার ভাষার জন্য এখনও অনেকে সংগ্রাম করছে। সংগ্রাম কখনও শেষ হয় না, লড়াই একটি অব্যাহত প্রক্রিয়া। যেমন করে ১৯৬৯-এ গণঅভ্যুত্থানের এ দেশে ছাত্র-জনতা লড়াই করেছে, অন্যায়ের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়িয়েছে, রক্ত দিয়েছে মানুষের মুক্তির জন্য। যেমন করে ১৯৭১-এর মুক্তিযুদ্ধে বুক পেতে দিয়েছে, এই দেশের সর্বস্তরের মানুষ। তারা কেউ বাবা, কেউ মা, বাবা-মায়ের সন্তান। যেমন করে '৯০-এর গণঅভ্যুত্থানে স্বৈরশাসকের বিরুদ্ধে লড়াই করতে যেয়ে আত্মাহুতি দিয়েছে কত বাবা-মায়ের সন্তান। যেমন করে ১৯২৪-এর গণতান্ত্রিক বিপ্লবে মুক্তির লড়াইয়ে বুক পেতে দিয়েছে কত বাবা-মায়ের সন্তান।

এরপর ১৩ পৃষ্ঠায়

লাল বসন্তের ফুল ও পুরাণের গল্প

শোয়াইব জিবরান

প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী আয়োজন

পুরাণের সে বিখ্যাত গল্পটি প্রসঙ্গে যাওয়ার আগে আমরা একটু প্রকৃতির নিয়মের দিকে তাকাতে চাই। এ মহাবিশ্বে সবকিছু একটি নিয়মে আবর্তিত হচ্ছে। আমাদের প্রিয় সবুজ পৃথিবীটাও সে আবর্তনের অংশ। পৃথিবী আবর্তিত হচ্ছে সূর্যকে কেন্দ্র করে। সে আবর্তনকে কেন্দ্র করে পৃথিবীর প্রকৃতিতে নানা পরিবর্তন ঘটে চলেছে। তার মধ্যে ঋতুর পরিবর্তন একটি সবচেয়ে দৃশ্যমান পরিবর্তন। সূর্যের আলোর তারতম্যের কারণে পৃথিবীর বিভিন্ন অংশে বিভিন্ন রকম আবহাওয়া তৈরি হচ্ছে। যার রূপ প্রতিটি আবর্তনের সাথে তার রূপ পরিবর্তন করছে। মানুষ এগুলো চিহ্নিত করেছে ঋতু হিসেবে। পৃথিবীর নানা অংশে ঋতুর সংখ্যা ভিন্ন ভিন্ন। তার মধ্যে দুটো ঋতু প্রায় পৃথিবীর সকল অংশেই আলোচিত। তার একটি শীত ও অন্যটি বসন্ত। এ দুটো ঋতুর প্রভাব প্রাণ-প্রকৃতি ও মানুষের ওপর প্রবল। শীত হচ্ছে প্রকৃতি ও মানুষের কাছে একটি প্রতিকূল ঋতু। এ ঋতুতে গাছপালার সবুজ পাতা ঝরে যায়। শুকনো শীতের শুষ্ক হাওয়া বইতে থাকে। প্রকৃতি হয়ে পড়ে রিক্ত, মলিন। এর পরেই একদিন প্রকৃতিতে আসে রঙিন বসন্ত। বসন্ত যেন প্রকৃতির নবজন্ম। পাতা ঝরে যাওয়া মৃতপ্রায় গাছগুলোতে নতুন পাতা গজায়। প্রকৃতি হয়ে ওঠে সবুজ, প্রাণময়। ফুলের গাছগুলোতে নানা রঙের ফুল ফোটে। নানা রঙের ফুলগুলো আবার মানুষ নানাভাবে গ্রহণ করে। লাল গোলাপ যেমন প্রেমের প্রতীক আবার লাল শিমুল পলাশ কৃষ্ণচূড়া বিদ্রোহ, বিপ্লব, জাগরণের প্রতীক। সমাজে কোনো বৈপ্লবিক পরিবর্তন এলে মানুষ বলে লাল বসন্ত।

দেয়ালচিত্রে শেখ হাসিনার পতনের দাবিতে ১ দফা, ৩ আগস্ট ২০২৪

প্রকৃতিতে ঋতু যেমন ভাগ করা আছে, তেমনি মানুষের জীবনকালকেও ভাগ করা হয়েছে। শৈশব, কৈশোর, তারুণ্য আর বার্ধক্য। প্রকৃতিতে শীত আর বসন্ত যেমন বিপরীত প্রতীক, মানুষের জীবনেও তেমনি তারুণ্য আর বার্ধক্য বিপরীত প্রতীক। তারুণ্য হচ্ছে বসন্তের মতো আর শীত বার্ধক্যের। প্রকৃতিতে বসন্ত যেমন পরিবর্তন নিয়ে আসে, মানবসমাজেও তেমনি তারুণ্য নিয়ে আসে পরিবর্তন। কিন্তু প্রকৃতির পরিবর্তনের শক্তি প্রাকৃতিকভাবেই থাকে।

এরপর ১৩ পৃষ্ঠায়

প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী আয়োজন ২০২৪

ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক
আবুল কালাম আজাদ

প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী আয়োজন সম্পাদক
মাহবুব আজীজ

সম্পাদনা সহযোগী
শাহেরীন আরাফাত

বিজ্ঞাপন ব্যবস্থাপনা
ফরিদুল ইসলাম

প্রচ্ছদ
মোহাম্মদ ইকবাল
আনিসুজ্জামান সোহেল

গ্রাফিক্স
বোরহান আজাদ

প্রকাশক : আবুল কালাম আজাদ কর্তৃক সমকালের বিশেষ সংখ্যা হিসেবে টাইমস মিডিয়া লিমিটেড ৩৮৭, তেজগাঁও শিল্প এলাকা ঢাকা থেকে মুদ্রিত।
ফোন : ৫৫০২৯৮৩২-৩৮।
ফ্যাক্স : ৫৫০২৯৮৪২
বিজ্ঞাপন : ৫৫০২৯৮৪৩।
ইন্টারনেটে পড়ুন
www.samakal.com

বাংলাদেশের উন্নয়নের
অগ্রযাত্রার গর্বিত সহযাত্রী

আমাদের
ব্র্যান্ডগুলিই
আমাদের **ইতিবাচক**
পরিবর্তনের শক্তি

Unilever

মুদারাবা
মাসিক আয়
আমানত প্রকল্প

১ লাখে
মুনাফা
১০০০ টাকা

প্রকল্পের সুবিধাসমূহ:
- মাস শেষ হলেই মাসিক মুনাফা
- সর্বোচ্চ ৮০% পর্যন্ত বিনিয়োগের সুবিধা
- সর্বনিম্ন এককালীন ৫০,০০০ টাকা বা এর গুণিতক যেকোনো পরিমাণ টাকা জমা করা যাবে
- ১, ৩ ও ৫ বছর মেয়াদি

EXIM BANK
শরী'আহ ভিত্তিক ইসলামী ব্যাংক
এক্সপোর্ট ইমপোর্ট ব্যাংক
অব বাংলাদেশ পিএলসি.

তথ্যের জন্য 16246
www.eximbankbd.com

LABAID CANCER HOSPITAL
AND SUPER SPECIALITY CENTRE
Winning Cancer
HOTLINE 10664
017 6666 2222

দেশের প্রথম ও একমাত্র
ডিজিটাল ব্রেস্ট টমোসিন্থেসিস
3D ম্যামোগ্রাম

ডিজিটাল ব্রেস্ট বায়োপসি গাইডেন্স সিস্টেম
স্টেরিওট্যাকটিক ইন্টারভেনশনাল প্রসিডিওরের জন্য

প্রাথমিক পর্যায়ে রোগ নির্ণয়
- জীবন বাঁচায়
- স্তন রক্ষা করে
- চিকিৎসার সময় কম লাগে
- জীবনের মান বজায় থাকে

- আমাদের প্রাথমিক ও প্রধান লক্ষ্য রোগীদের সর্বোচ্চ মানের সেবা প্রদান করা, তাই আমরা আমাদের ব্রেস্ট সেন্টারে **ডিজিটাল ব্রেস্ট টমোসিন্থেসিস** যুক্ত করেছি
- আমরা **METALTRONICA (ITALY)** থেকে **HELIANTHUS DBT** সিস্টেম বেছে নিয়েছি, কারণ ক্লিনিকাল স্টাডিজ দেখায় যে এটি আরও বিস্তৃত ম্যামোগ্রাম তৈরি করে

৪০ বছরের বেশি বয়সী প্রতিটি মহিলার বছরে একবার স্তন ক্যান্সার নির্ণয়ের জন্য পরীক্ষা করা উচিত
— আমেরিকান ক্যান্সার সোসাইটি

আপনার ম্যামোগ্রামের সময়সূচী নিশ্চিত করতে কল করুন ১০৬৬৪ নাম্বারে

২৬ গ্রীন রোড, ধানমন্ডি, ঢাকা-১২০৫, বাংলাদেশ
www.labaidcancer.com
/labaidcancerhospital
/company/labaid-cancer-hospital
/labaidcancerhospital
Scan Me

প্রচ্ছদ :: আনিসুজ্জামান সোহেল

বাকস্বাধীনতা মানবাধিকার

৭ বছরে সমকাল
মুক্তপ্রাণ | মুক্তধারা

সমকাল

প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী আয়োজন ১

বৃহস্পতিবার
২০ অগ্রহায়ণ ১৪৩১
৫ ডিসেম্বর ২০২৪

মতপ্রকাশ প্রসঙ্গে

আবুল কাসেম ফজলুল হক

কথা বলার স্বাধীনতা, মতপ্রকাশের স্বাধীনতা, সংবাদপত্রের স্বাধীনতা, ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য, সরকারি নিয়ন্ত্রণ ইত্যাদির কথা দ্বারা যে সমস্যাকে বোঝানো হয়, বর্তমান আলোচনায় সে বিষয়েই কিছু কথা বলব। চিন্তার স্বাধীনতার মর্মার্থ হলো, স্বাধীনভাবে চিন্তা ও মতপ্রকাশ করার স্বাধীনতা। বাংলাদেশের সমস্যাই আমাদের বিবেচ্য।

যারা বিবেকমান, চিন্তাশীল ও সক্রিয় ব্যক্তিত্বের অধিকারী, তারা দেশের চলমান অবস্থাকে নিরাপদ মনে করেন না। কেবল আজকের কথা নয়, স্বাধীন বাংলাদেশের গোটা সময়টা ধরেই এই অবস্থা চলমান। তবে এরই মধ্যে প্রায় সকলে অনুভব করেছেন, আমাদের বর্তমান খারাপ হলেও ভবিষ্যৎ ভালো হবে। নিজের জাতির প্রতি জনসাধারণের এই আস্থা ও আশাই বাংলাদেশকে অস্তিমান রেখেছে। রাজনীতির দুর্গতি দেখে মানুষ বারবার মর্মাহত হয়। কিন্তু আশা ছাড়ে না। বাংলাদেশে রাজনীতি তো এখন রাজনীতিবিদদের আয়ত্তের বাইরে চলে যাচ্ছে! রাজনীতিতে সক্রিয় ব্যক্তিত্বের মধ্যে তো আত্মজিজ্ঞাসা, আত্মসমালোচনা ও আত্মশুদ্ধির কোনো প্রচেষ্টা খুঁজে পাওয়া যায় না।

▶▶ এরপর ৬ পৃষ্ঠায়

ইতিহাসের দেশে

আফসান চৌধুরী

প্রাচীন বাংলার ইতিহাস একসময় আমার বিদ্যাপাঠের প্রধান বিষয় ছিল। আমার মাস্টার ডিগ্রিটা সেই বিষয়ের ওপর। কিন্তু এমএ পাস করার পর আমি যোগ দিই "স্বাধীনতা যুদ্ধের দলিলপত্র প্রকল্পে"। ভাবলাম কিছুদিনের মধ্যেই ফিরব মাস্টার হয়ে। সেটা আর হয়নি। একই সঙ্গে আমি চলে যাই ইতিহাস চর্চার অন্য পরিসরে কাজকর্ম ও আগ্রহের কারণে। আমার কাছে একাত্তরের ইতিহাস চর্চার সাথে দেশপ্রেমের কোনো সম্পর্ক নেই। এটা ইতিহাস চর্চার একটি বিষয়, এটুকুই। দেশপ্রেম ভিন্ন পরিসরে প্রকাশ পেতে পারে। তবে তথ্যভিত্তিক রাজনৈতিক ভাবনা ও উদ্দেশ্যমুক্ত ইতিহাস চর্চা একমাত্র পন্থা হওয়া উচিত।

২.

১৯৭১-এর ইতিহাসের সাথে এতদিন হেঁটেই বুঝি, অতীত নিয়ে আমাদের ধারণাগুলো বর্তমানের ভাবনা ও প্রয়োজনে নির্মাণ করি অনেক ক্ষেত্রে। আমাদের অতীত জানার ক্ষেত্রে প্রভাবিত করে আজকের দরকারটা। তাই অতীত জানা বা তার চেহারা আমাদের বর্তমানের চিত্র বদ্ধন করে, আমাদের এই দুই কালকে এক করে তৃতীয় কোনো পরিসর তৈরি করে। ইতিহাস সাজাই যে যার পছন্দমতো।

▶▶ এরপর ১৩ পৃষ্ঠায়

সাক্ষাৎকার

কবি ও গবেষক **ফরহাদ মজহার**। জুলাই গণঅভ্যুত্থানের প্রেক্ষাপট ও রাজনৈতিক বাস্তবতা নিয়ে সম্প্রতি কথা বলেছেন সমকাল-এর সঙ্গে। সেখানে উঠে এসেছে রাষ্ট্র গঠন, রাজনৈতিক দল ও ভূরাজনীতির বিভিন্ন দিক। সাক্ষাৎকার নিয়েছেন **শাহেরীন আরাফাত**

'গণঅভ্যুত্থানই গণতন্ত্র'

ফরহাদ মজহার

● ৫ আগস্ট বাংলাদেশের ইতিহাসে এক নতুন যাত্রা সূচিত হয়েছে। এটিকে কীভাবে ব্যাখ্যা করবেন?

●● প্রথমত, ৫ আগস্ট গণঅভ্যুত্থানের তাৎপর্যপূর্ণ দিক হলো– এটি আমাদের জনগণের অভিপ্রায়; ব্যক্তি হিসেবে সে যে এক স্বাধীন সত্তা, তার ভেতর যে এক কর্তা রয়েছে, সেটি সে উপলব্ধি করতে পারছে। আমরা কিন্তু এখন আর সামন্তীয় সমাজে বাস করছি না। সামন্তীয় সমাজের চেতনাগত স্তর হলো, আমরা সবাই কোনো না কোনো প্রাকৃতিক সম্পর্কের অধীন। আমি আমার পিতার অধীন, বা পরিবারের অধীন, অথবা যারা সমাজের মাতবর বা জমিদারের অধীন। ওই বোধের সঙ্গে এই ব্যক্তি কর্তার বোধ, যে মনে করে– আমি স্বাধীন, সেটি ভিন্ন। এই বোধ বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক কালপর্বে আসে। জুলাই গণঅভ্যুত্থানে এই কর্তাসত্তা, ব্যক্তিসত্তার একটা অভিপ্রকাশ আমরা দেখেছি। এই অভিপ্রকাশের রাজনীতি আমরা পরিষ্কার বুঝতে পেরেছি। এর পাশাপাশি আমাদের পুরোনো রাষ্ট্র, পুরোনো রাজনৈতিক সম্পর্ক এখন আর কাজ করবে না। নতুন রাজনৈতিক সম্পর্ক আমাদের তৈরি করতে হবে। অর্থাৎ নতুনভাবে বাংলাদেশ গঠন করতে হবে– এই বোধ এই গণঅভ্যুত্থানে এসেছে।

এখানে দুটি বিষয় খুব গুরুত্বপূর্ণ– এক. ব্যক্তির কর্তাসত্তার স্বীকৃতি, দুই. ব্যক্তির মর্যাদার স্বীকৃতি। এরই পরিণতি হিসেবে যে রাজনৈতিক চিন্তা, তা হলো ব্যক্তিকে বর্তমান করে তোলা– ব্যক্তিস্বাধীনতা, ব্যক্তির মর্যাদাকে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দেওয়া– সামাজিক ন্যায়বিচার। অর্থাৎ ব্যক্তির সঙ্গে ব্যক্তির এই সম্পর্ক ন্যায়বিচারভিত্তিক হতে হবে। এই সম্পর্ককে একটা প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দেওয়া; একটা নতুন গঠনতন্ত্র প্রণয়ন করা; নতুনভাবে বাংলাদেশ গঠন করা– এই দাবি এখানে হাজির হয়ে গেছে। এখন আর আমরা এই দাবির পেছনে ফিরে যেতে পারব না। এখন আমাদের এই দাবি পূর্ণ করতে হবে। আমরা তা করতে পারিনি।

▶▶ এরপর ১৩ পৃষ্ঠায়

With the best compliments
From

MUTUAL GROUP

- **MUTUAL SHIPPING LIMITED**
  (Shipping Agent/Coastal Vessel Owner)
- **MUTUAL TRADING LIMITED**
  (C & F Agent)
- **MUTUAL SHIPPING LINES**
  (Local Agent of Submarine Cable installation Project (SMW-4), Fujitsu, Japan, Tyco Telecom, U.S.A.)
- **CENTRAL NAVIGATION LIMITED**
  (Owners of Inland Coastal Vessels)
- **PANCHARAGH UDAYON SANGSTHA LIMITED**
  (Berth Operator, Berth No. 8, Chittagong Port Authority)
- **MODERN LOGISTICS**
  (Container Carrier & Carrying Contractor)
- **SUN VALLEY DEVELOPMENTS LTD**
  (Real Estate & Developer)
- **MTech**
  (One Stop Equipment & Engineering Solution)
- **ARK- ADDICTION REHABILITATION CENTRE**
  (A Corporate Social Concern of Mutual Group)

WE PROVIDE COMPLETE LOGISTICS SOLUTIONS

Corporate Office:
SHAHJDI CHAMBER (2ND FLOOR),
1331/B, SK. MUJIB ROAD, AGRABAD,
CHITTAGONG-4100, BANGLADESH.
PHONE: +880-31-712148, 724401 & 2525887/89,
FAX: +880-31-720303
E-MAIL: info@mutualbd.com, ops@mutualbd.com

Liaison Office:
NABI MARKET,
KHATUNGONJ,
CHITTAGONG, BANGLADESH.
PHONE: +880-31-611505
FAX: +880-31-610043
E-MAIL: rais34920@gmail.com

২০২৩ সালে মেটলাইফের গ্রাহকরা বীমা থেকে পেয়েছেন

২,৯৮১ কোটি টাকা

মেটলাইফ কথা দিয়ে কথা রাখে।

আমার ছেলে আর নেই, কিন্তু বীমার টাকা পেয়ে মনে হচ্ছে যেন আমার ছেলে এখনো কামাই করে দিচ্ছে।

বীমার টাকা পেয়ে মনে হলো আমি যেন পুনর্জীবন পেলাম।

এতো সহজে আমার অ্যাকাউন্টে টাকা চলে আসাটা নতুন ধরনের একটা অভিজ্ঞতা।

বীমা হচ্ছে আমার জীবনের একটা অভিভাবকের মতন।

এতো সহজে ক্লেইম পাওয়া যায় এটা আমার কল্পনাতেই ছিল না।

MetLife
Navigating life together

ইসলামী ব্যাংক
বাংলাদেশ পিএলসি. | ইসলামী শরী'আহ্ মোতাবেক পরিচালিত

মাসে মাসে জমা করি
অবসরের সঞ্চয় গড়ি

মুদারাবা স্পেশাল সেভিংস অ্যাকাউন্ট (MSSA)

ছোট ছোট সঞ্চয় একদিন স্বপ্নের সমান বড় হয়। অবসর জীবন বা ভবিষ্যতের নানাবিধ প্রয়োজন পূরণে যেকোনো পেশার মানুষ এই স্কিমে সহজেই সঞ্চয় শুরু করতে পারেন। ৫০০ টাকা থেকে ৫০ হাজার টাকা পর্যন্ত এই অ্যাকাউন্টে মাসিক কিস্তিতে জমা করে মেয়াদ শেষে পাচ্ছেন শরী'আহ্সম্মত মুনাফা। সেলফিন অ্যাপেও এই অ্যাকাউন্ট খোলা যায়।

www.brbhospital.com

কাঙ্খিত সেবার ঠিকানা | ISO 9001 2015 CERTIFIED

আপনার সুস্থতা আমাদের অগ্রাধিকার।

আর যে কোন চিকিৎসা সেবার প্রয়োজনে আস্থা রাখুন বিআরবি হসপিটালস-এ।

সেবায় • আস্থায় • নির্ভরতায়

ইন্টারনাল মেডিসিন • সুরক্ষিত নরমাল ও ব্যথামুক্ত নরমাল ডেলিভারি • আইসিইউ এন্ড এইচডিইউ, এনআইসিইউ এন্ড পিআইসিইউ
নিউরো আইসিইউ • আইভিএফ এন্ড আইইউআই সেন্টার • ব্যথামুক্ত এন্ডোস্কপি এন্ড কোলনোস্কপি
হেপাটোবিলিয়ারি প্যানক্রিয়াটিক সার্জারি সেন্টার • গ্যাস্ট্রোলিভার সেন্টার • অবস এন্ড গাইনি • নবজাতক ও শিশু
ইনফার্টিলিটি • কিডনি রোগ • ডায়ালাইসিস • ইউরোলজি এন্ড এন্ড্রোলজি • জেনারেল এন্ড ল্যাপারোস্কপিক সার্জারি
কলোরেক্টাল সার্জারি • কার্ডিওলজি • রক্তরোগ • বক্ষব্যাধি • নিউরো ইলেক্ট্রোফিজিওলজি • স্লিপস্টাডি • মেডিকেল অনকোলজি
নিউরোমেডিসিন • নিউরো সার্জারি • ইএনটি-হেড-নেক সার্জারি • ব্রেস্ট ইউনিট
বার্ন এন্ড প্লাস্টিক সার্জারি • অর্থোপেডিক এন্ড স্পাইন সার্জারি • ডায়াবেটিস এন্ড এন্ডোক্রাইনোলজি • মনোরোগ
চর্ম ও যৌন রোগ • ভাস্কুলার সার্জারি • ডেন্টাল সেন্টার • ফিজিওথেরাপি সেন্টার
ফুড এন্ড নিউট্রিশন • রেডিওলজি এবং ইমেজিং • ল্যাবরেটরি মেডিসিন • ট্রান্সফিউশন মেডিসিন

বিআরবি হসপিটালস লিমিটেড
BRB HOSPITALS LIMITED

এপয়েন্টমেন্ট 10647
৭৭/এ, পান্থপথ, ঢাকা-১২১৫

ছবি :: এপি

প্রচারমাধ্যমে স্বাধীনতা নিরর্থক হয়ে পড়েছে

মানস চৌধুরী

প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী আয়োজন

ম্যাস-মিডিয়ার বাংলা আমি লাগাতার প্রচারমাধ্যম করে আসছি, চলতি গণমাধ্যমকে পরিহার করতে চাই বলেই। 'গণমাধ্যম' কথাটি ম্যাস-মিডিয়ার তর্জমা হিসেবে দশকের পর দশক চলে আসছে, আর সেটার কারণও খুব সংগত। কিন্তু আমার তরফে প্রচারমাধ্যম ব্যবহার করাটা নিছক তর্জমার বিষয় নয়। আমার হাতে সুযোগ থাকলে আমি ইংরেজির 'ম্যাস' কথাটাও বদলে দিতাম। অনেকেই জানেন, বা বোঝেন, তাও আরেকবার ঝালিয়ে নিলে আমি নিরাপদে থাকতে পারি। ইংরেজি ভাষায় 'ম্যাস' শব্দটির দ্যোতনা বা ব্যঞ্জনা রাজনৈতিকভাবে দুই দিকেই কাটত– ভারে এবং ধারে। দুইভাবেই কাটত– প্রতিপক্ষতায় ও সংহতিতে। ভারে, কারণ এই পক্ষে বিপুল লোকজন গ্রাহক আছেন তা টের পাওয়াই যেত। ধারে, কারণ সেই বিপুল লোকজনের অস্তিত্বের সাথে মানানসই রাজনৈতিক তৎপরতার নজির ছিল। অন্যদিকে প্রতিপক্ষতার বিষয়টা অনেকাংশেই সাংস্কৃতিক মূল্যবোধজনিত। 'ম্যাস' মানেই তা মুষ্টিমেয় নয়, তা 'এলিট' বিপক্ষীয়। ফলে আর্ট-কালচার-সংবাদ-সন্দেশ জগতে 'ম্যাস' রুচির প্রহরীদের তথা উচ্চমর্যাদার দাবিদারদের অপছন্দের বিষয় ছিল। 'হাইআর্ট'-এর বিপরীতে নিছকই 'মন্দরুচি'র তকমা পেতে থেকেছে যা কিছু 'ম্যাস'। শিথিল করে বললে, শাসকবর্গের অপছন্দের রাজনৈতিক বর্গ 'ম্যাস'– জমাট বেঁধে থাকা গাদাগাদা মানুষ।

সংবাদপত্র ও রেডিওর মতো প্রযুক্তি যখন বিস্তার লাভ করতে শুরু করেছে ইউরোপে, তখন তা 'ম্যাস' মিডিয়া না হবার উপায় ছিল না। প্রকৃতার্থেই বহু মানুষ এর গ্রহীতা হয়ে পড়ল। গ্রহীতাকুলের মধ্যকার একটা শিথিল সংহতির জায়গা হলো এটা। 'রুচি'র শাসন ও উচ্চবর্গের একচেটিয়া দখলদারিত্ব থেকে 'আর্ট' এবং 'নিউজ' দুই-ই তুল্যবিচারে আমমানুষের সন্নিকট হলো। 'ম্যাস'কে অপছন্দ করতেন যারা, তাদের জন্যও তাই 'গণ' থাকতে পেরেছে 'গণ' হয়েই, আর যারা 'ম্যাসে'র সাথেই সন্নিকট বোধ করেছেন তাদের জন্য তো কথাই বাহুল্য। কিন্তু, এখন কী অর্থে? এখনকার মিডিয়া তো গোড়া থেকেই 'ম্যাস'-এর ভোগসামগ্রী। যে কালে গণের সাথে মুষ্টিমেয়'র সংস্কৃতি/সংবাদ/শিল্পচর্চার বৈপরীত্য প্রামুক্তিকভাবেই প্রতিষ্ঠিত ছিল, সেখানে এই নামের যাথার্থ্য থেকে থাকতে পারে। আর নেই। কিন্তু এটাই আমার আপত্তির প্রধান কারণ নয়। এটা তো আছেই, এর সাথে 'গণ'-এর যে রাজনৈতিক অস্তিত্ব তার সাথে সংবাদমাধ্যমগুলোর ক্রমাগত দূরত্বই আমার আপত্তির প্রধান কারণ। বিশ্বের নানান জায়গায় নানানভাবে সংবাদমাধ্যমগুলো গণবিদ্বেষী হয়ে উঠেছে বহু বছর ধরে। যেখানে বিদ্বেষী নয়, সেখানেও গণ (বিষয়ে) নির্লিপ্ত। এসব প্রবণতার মধ্যেই আমি প্রচারমাধ্যম বলতে থাকি। তাতে অন্তত সংবাদমাধ্যম এবংবা মিডিয়ার সম্প্রচার-করে-প্রতিষ্ঠিত-করার অভ্যাসটা চিহ্নিত হয়। আলোচ্য এই প্রবণতা কোনো আমল-নির্দিষ্ট নয়, অন্তত আমি দেখতে পাই না এভাবে। এমন গুরুতর কোনো লক্ষণ নেই যে আমি বলতে চাইব হাসিনা-রেজিমের তুলনায় অমুক রেজিম আমার জন্য আনন্দদায়ক গণতান্ত্রিক ছিল। এমনকি আমি রাজনৈতিক মসনদের পালাবদলের সাথে খুব সম্পর্কিত করেও দেখি না প্রচারমাধ্যমের পালোয়ানগিরিকে।

বিগত রেজিম নিবর্তনমূলক আইনকানুন দিয়ে মতপ্রকাশের তথাকথিত চর্চাকে সন্ত্রস্ত করে যে রেখেছিল সেটা একটা সাধারণ স্বীকৃত বিষয়। এতটাই যে তা নিয়ে অধিক যুক্তি আর কারোরই দেওয়ার দরকার পড়বে না। ৫৭ ধারা থেকে ডিএসএ আইনের ক্ষয়ক্ষতি এখনও আলোচিত; এবং এখনও ডিএসএ-নিগৃহীত মানুষজন অন্তর্বর্তী সরকারের কাছে লাগাতার আকুতি জানিয়ে যাচ্ছেন যাতে তারা ধারাবাহিক নিবর্তন থেকে পরিত্রাণ পান। সরকার মৌখিক প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। অনেকের মতো আমিও আশা করি যে এই পরিস্থিতিটা তারা জিইয়ে রাখবেন না।

কিন্তু আমার আগ্রহ আরেকটা জায়গায়। একটা ইংরেজি রচনাতে আমি স্পষ্ট করেই লিখেছিলাম যে কিছু পেশার মানুষজন যা ও যেভাবে বিশ্লেষণ ও প্রকাশ করতে পারতেন তার ব্যাপক চর্চা করেননি। তার মধ্যে প্রথমেই আছে আমি যে পেশাটাতে আছি– মাষ্টারি। শিক্ষকদের ওপরও নিবর্তনমূলক খড়্গ নেমেছিল। চট্টগ্রামের শিক্ষক মাইদুল ইসলাম কিংবা বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের সিরাজুম মুনীরা এর নিকৃষ্ট উদাহরণগুলোর মধ্যে আছেন। জগন্নাথের শিক্ষার্থী খাদিজার কথাও পাঠকদের জ্বলজ্বলে মনে থাকতে পারে। এর বাইরে স্কুল ও কলেজের শিক্ষকদের তালিকা দুশ্চিন্তিত হবার মতো বড় ছিল। তারা অনেকেই এখনও অপেক্ষা করে আছেন নতুন সরকারের পদক্ষেপের জন্য। লক্ষ্য করবেন যে, নিগ্রহের শিকার এসব প্রকাশিত মন্তব্যের প্রায় সবই ছিল সাইবারস্পেসে যেখানে নজরদারি সহজ ও তীব্র ছিল। শ্রেণিকক্ষে কিংবা সহকর্মীদের নিজস্ব সভাসমিতিতে এই নজরদারি সম্ভব ছিল না। কিংবা থাকলেও সেটার বরাতে আইনি রাস্তায় নিগ্রহ অত্যন্ত দুরূহ ছিল সরকারের জন্য। কিন্তু বাস্তবে সেসব অঞ্চলেও ভ্যাবদা ধরনের উপস্থিতি শিক্ষকদের থেকেছে বছরের পর বছর। উল্টো বলা যায়, রেজিমের প্রতি আনুগত্য দেখানো শিক্ষকদের সংখ্যাই বেখাপ্পা রকমের বেশি ছিল, আসে যায় না এই মুহূর্তে মোচড়ামুচড়ি করে কারা নিজেদের সাফসুতরো ও 'অভ্যুত্থানপক্ষীয়' দেখানোর চেষ্টা করছেন। এই স্ব-নিষেধাজ্ঞা বা সেল্ফ-সেন্সরশিপকে না চিহ্নিত করে মতপ্রকাশ বিষয়ক কোনো আলাপই সম্ভব নয়। বাস্তবে বাংলাদেশের মধ্যবিত্ত পেশাজীবীদের সিংহভাগই বেছে নিয়েছিলেন শাসনব্যবস্থার অনুকূল মতামতই প্রকাশ করতে। এ রকম পরিস্থিতিতে মতপ্রকাশের স্বাধীনতার আলাপ পিচ্ছিল ও বিভ্রান্তিকর হতে বাধ্য। একক পেশাজীবীদের এই আনুগত্যের চর্চাকে গুরুত্বপূর্ণ প্রপঞ্চ মেনেও আমি এখন আলাপ করতে চাই সংবাদ সংস্থাগুলো নিয়ে। প্রথমেই বিপুলসংখ্যক সংবাদপত্র ও পোর্টালের বাস্তবতাতে নজর দেওয়ার দরকার আছে। অসতর্ক থাকলে আমার কথার এই মানে করে বসতে পারেন যে আমি সংখ্যা নিয়ন্ত্রণের পক্ষে। আমি এ রকম কিছু ভাবিনি। তা ছাড়া ৫০০ পাঠকের সংবাদপত্র মালিক আর্থিকভাবে কীভাবে প্রতিষ্ঠানটি চালিয়ে যাচ্ছেন, সেসব প্রশ্ন সহজ নয়; আবার আপনারা একদম বোঝেন না, তাও নয়। প্যাঁচানো কারসাজির আর্থিক ব্যবস্থাপনা বুঝবার কিছু লোক আপনার-আমার চারপাশেই আছেন। খুব অসুবিধা হলে কাউকে জিজ্ঞাসা করে বুঝে নিন। আমি সাধারণ একটা তুল্য পরিস্থিতির নিউজ-ইমাজেন্সির পাটাতনটা পর্যালোচনা করছি মাত্র। যখন টেলিভিশন কেবল একটা, এবং সেটা রাষ্ট্র-পরিচালিত, তাই সরকার-নিয়ন্ত্রিত হয়ে দাঁড়ায় তখনকার সংবাদ-গুরুত্ব আর যখন চাইলে ২০টা টেলিভিশনে বা ৪০টা পত্রিকায় বা ১০০টা পোর্টালে আপনি সংবাদ দেখতে পারেন তখনকার সংবাদ-গুরুত্ব একই থাকে না। এসব ক্ষেত্রেই 'বিগহাউস' প্রসঙ্গটা চলে আসেই। যে কোনো রাষ্ট্রেই আসে। ফলে সারাক্ষণই এটা একটা মৌলিক জিজ্ঞাসা যে 'বড়-বড়' পত্রিকার/সংবাদ সংস্থার খবর সংগ্রহের কারিগরি কী, খবর প্রকাশের প্রণালি বা প্রবণতা কী, সেসব প্রবণতায় দেখা ও আনদেখার জমিনগুলো কী; এবং চূড়ান্ত বিচারে তাদের পক্ষপাত কোথায়।

যারা ভাবতে আনন্দ পাচ্ছেন যে ৫ আগস্টের অভ্যুত্থানের পর সংবাদ সংস্থাগুলো আমূল বদলে গেছে তারা নিজেরা প্রতারিত হচ্ছেন, এবং এই ভাবনা প্রচার করতে থাকলে আমাদেরও প্রতারিত করছেন। বদলেছে আওয়ামী মন্ত্রীদের সিভিপ্রকাশ, ছবিপ্রকাশ, বাণীপ্রকাশ; কিংবা 'সরকারের' 'সাফল্যের' ফিরিস্তি। প্রধানমন্ত্রীর গোঁয়ার ও হিংস্র কথাগুলো সম্প্রচার, সেসব কথাকে 'অগ্রগতির আত্মবিশ্বাস' হিসেবে সাফাই-গাওয়া নিবন্ধ। তালিকাটা বড় এবং অনায়াসেই বিভ্রান্ত হয়ে পড়বার মতো। কিন্তু বদলায়নি যা তা ভয়ানক সব এলাকা– বিদ্যমান শাসনব্যবস্থাকে প্রশংসা করতে থাকা, শ্রমিকদের দাবিদাওয়া নিয়ে নিরাসক্ত থাকা। এই অবদলগুলো আরও দুশ্চিন্তার বিষয়, যেহেতু আপনি-আমি আশু আরেকটা রাজনৈতিক রূপান্তরের কল্পনাটাও করতে পারছি না।

৫ তারিখের পর কোনো মুখ্য অনুসন্ধানী প্রতিবেদন পড়েছেন ১৫ বছরে সেনাবাহিনীর এক্সট্রা-দাপ্তরিক কর্মকাণ্ড নিয়ে? তাদের বাণিজ্যে আগ্রহ নিয়ে? কিংবা হঠাৎ গণতন্ত্রের রক্ষাকারী হিসেবে আবির্ভাবের মাজেজা নিয়ে? কোনো ক্রিটিক্যাল নিবন্ধ পড়েছেন যে কেন ও কীভাবে তাদের অভ্যুত্থান-বিজয়ীরা অগ্রসূত মানলেন? শ্রমিকদের লাগাতার অসন্তোষের জবাবে সমন্বয়কদের পক্ষ থেকে 'স্বৈরাচারের দোসর' আখ্যা দেওয়ার বেহুদাপনা নিয়ে? আনসারদের অসন্তোষ নিয়ে বর্তমান সরকারি ভাষ্যের বাইরে কোনো ফরেনসিক প্রতিবেদন পেয়েছেন? মুখ্য পত্রিকায়? কিংবা উপদেষ্টা আসিফ মাহমুদ যখন সাকিব আল হাসানের করণীয় বাতলাচ্ছিলেন তাঁর ভাষ্যের অপ্রশাসকীয় গোঁয়ার্তুমি ও জনতুষ্টিমূলক প্রবণতাকে চিহ্নিত করে? এগুলো কতগুলো নৈবাৎ বাছাই মাত্র। সবগুলো নয়।

শেষ করি একটা ছোট অথচ তীব্র উদাহরণ দিয়ে। অভ্যুত্থানের ৫৩ দিন পর ২৮ সেপ্টেম্বর একটি পত্রিকায় "আদি ইতিহাসের আলোকে পার্বত্য চট্টগ্রামের আদিবাসী বিতর্ক" নামে একটা নিবন্ধ প্রকাশিত হয়। অনেক বছর ধরেই আমি সংবাদের এমন কোনো নিয়মিত পাঠক নই। এটা চোখে পড়া ছিল দৈবাৎ, কিংবা 'পাঠকের-এগিয়ে-দেওয়া' উপায়ে। পত্রিকাটির প্রোফাইলের কারণে আমার বরাবরই খুব আগ্রহের পত্রিকা। একদা আমি লিখতামও। নানান কারণে সেটা আর চলে না, কিন্তু সমীহটা একদম বলবৎ আছে। রচনাটি জাতীয়তাবাদী গরিমাযুক্ত, ইতিহাসকে গড়াপেটা/কারসাজিমূলক, পার্বত্যবাসীদের ভোগান্তিকে লঘুকারী, এমনকি চূড়ান্ত বিচারে রাষ্ট্রের সেটলার পলিটিক্স ও সেনাশাসনের সাফাইকারী। এ রকম একটা রচনা এ রকম গণপক্ষীয় হিসেবে কাজ করে আসছে, এমন একটা পত্রিকার প্রকাশ করতে হলো কেন? যদি অনবধানতাবশত হয় তাহলে এ রকম পত্রিকার পক্ষে তা বেমানান। কিন্তু আমি মনে করি না যে এটা নিছক অনবধানতাবশত প্রকাশ। এটা হলো সেই আরামের নিশ্চয়তা, যেখানে শাসকপক্ষীয় বয়ান/ন্যারেটিভে আরামে থাকতে চায় পত্রিকাটি। এই আরাম/কনভেনিয়েন্সেই হচ্ছে আমার বিবেচনার জায়গা। আর এই কারণেই আমি তথাকথিত 'মতপ্রকাশের স্বাধীনতা'কে নিরর্থক বলছি।

পাঠকের আগ্রহ থাকতে পারে ভেবে জানাই, আমি পত্রিকাটিতে দুইবার লিখিত (ইমেইল) আপত্তি জানাই। একবারও কোনো উত্তর তারা দেননি। এমনকি একটা পরিত্রাণমূলক কাজ হিসেবে 'আপনি তাহলে পাল্টা লেখেন' বলার মতো সুলভ-সস্তা রাস্তাটাও নেননি। এতটাই এই কনভেনিয়েন্সের দাম। এমনকি দেখুন, আমি যে আপনাদের পত্রিকাটির নাম বললাম না, তাই-বা কেন? কারণ, পত্রিকাটির নাম লিখলে যে পত্রিকার নিমন্ত্রণে লিখছি, সমকাল, এর ডেস্ক থেকে বলা হবে 'নামটা একটু বাদ দিয়া দেন ... বোঝেনই তো!' আপনারা এই বাক্য পড়তে পারছেন মানেই আমাকে কেউ বলেন নাই 'ন্যায্য কথা বলেছেন, প্রমাণ আপনার হাতে আছে, আসেন নাম বইলা দেন।' ওরা করবেন না, সমান্তরাল পত্রিকার সাথে সম্পর্কের কমফোর্ট জোন হারাতে চান না বলে। এই স্বাধীনতা আসলে রেটরিক, বাগাড়ম্বর। যে যা করছিলেন, তাই করে যাচ্ছেন। ❖

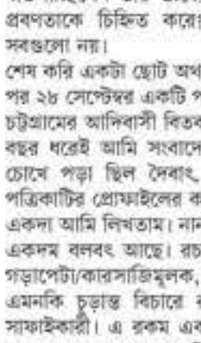

অধ্যাপক
জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়

মতপ্রকাশের স্বাধীনতা ও গণতন্ত্র

সামিনা লুৎফা

প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী আয়োজন

উনিশ শতকের শেষার্ধে জন ষ্টুয়ার্ট মিল মতপ্রকাশের স্বাধীনতা বিষয়ে যা বলেছিলেন, তা এই একুশ শতকেও বাংলাদেশে অনার্জিতই রয়ে যাচ্ছে যেন। মিল বলেছিলেন, একজন ব্যক্তির নিজেকে প্রকাশ করার অধিকার ততদূর পর্যন্ত যতদূর পর্যন্ত তা অন্য ব্যক্তির ক্ষতির কারণ না হয়। আবার মিল এও বলেছিলেন যে, স্বাধীনতার এই মূলনীতি যদি মতপ্রকাশের ক্ষেত্রে চিন্তা করি তাহলে যে কোনো একটি মতকে স্তব্ধ করে দেওয়ার অর্থ হতে পারে সত্যকে স্তব্ধ করার শামিল। মতামতের সঙ্গে সংলাপ করতে হবে আরেকটি মতামত দিয়ে, জোর খাটিয়ে বা ভাঙচুর করে নয়; এই স্বাধীনতার ওপরেই গণতন্ত্রের চর্চার শক্তি দাঁড়িয়ে থাকে। কারণ, কোনো দেশের নাগরিকরা তাদের মতামত স্বাধীনভাবে দিতে পারে না, যখন এমন কেউ সরকারে থাকে যে সমালোচনা সহ্য করছে না, সাধারণত কর্তৃত্ববাদী অগণতান্ত্রিক সরকার এগুলো করে থাকে। কাজেই সবার মত-আলোচনা-সমালোচনা না শুনলে গণতন্ত্র ব্যবস্থাপনার অন্যতম স্তম্ভ যে জবাবদিহি তা আর থাকে না। এমন এক সময়ে এ লেখা লিখতে বসেছি যখন দেশের প্রথম সারির দুটি সংবাদপত্রের অফিসের সামনে চলছে সংঘবদ্ধ হিংস্রতা আর অন্যদিকে রাষ্ট্রীয় বাহিনী আরেক দৈনিকের সম্পাদককে করছে এয়ারপোর্টে হেনস্তা বা গুলি করে মারছে পাওনা মজুরির দাবিতে আন্দোলন করা শ্রমিককে, দোহাই দিচ্ছে গোয়েন্দা রিপোর্টের কিন্তু ভুলে যাচ্ছে যে সরকারি বয়ান ফ্যাসিবাদে কিংবা অন্তর্বর্তীবাদে একই রকমের শোনাচ্ছে নাগরিকদের কানে।

একদল শিক্ষার্থী ঝাঁপিয়ে পড়ে ভাঙচুর-লুটপাট করছে অন্যের কলেজ, আদালত প্রাঙ্গণে কুপিয়ে হত্যা করা হচ্ছে সরকারি কৌঁসুলিকে। নাগরিকদের ভাস্কর্য, প্রতিমা, মাজার বা শিল্পস্থাপনা ভাঙচুর হয়েছে, বাউলদের চুল কেটে দেওয়া হয়েছে আবার সমুদ্রতীরে বেড়ানোর অপরাধে নাগরিকদের করা হয়েছে মারধর কিংবা আন্দোলনে ব্যবহার করা শেষে ছুড়ে ফেলা হয়েছে বা অকারণ ধাক্কাধাক্কিতে তাদের ত্যাগকে স্বীকার না করে পুনর্বাসিত করা হয়েছে ফ্যাসিবাদের সময় পুষ্ট হয়ে ওঠা ঘিঘোর দালালদের। আহত আন্দোলনকারীদের প্রতি দরদের অভাব প্রকট হয়ে উঠলেও সুযোগ খুঁজতে থাকা ভুঁইফোঁড়দের আড়ালে জুলাই হত্যাকাণ্ডের বিচারের কথা ভুলতে বসেছি। বাউল গানের আসর, কুদ্দুমেলা, আলোচনা সভা, নাটক, কনসার্ট ইত্যাদি কিছু মানুষের ধমকে বন্ধ বা ছোট করা হয়েছে। এসব ভালো লক্ষণ না, কারণ এসব বহুস্বরের উদযাপন ছাড়া সবার শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান এবং বৈষম্যহীন অন্তর্ভুক্তিমূলক সমাজ নির্মাণ সম্ভব নয়।

৫ আগস্ট-পরবর্তী সময়ে সেনাবাহিনীর বর্ণনা অনুসারে তাদের হেফাজতে থাকা আগের আমলের ছয় শতাধিক ব্যক্তি, যারা বিভিন্ন ক্যান্টনমেন্টে আশ্রয় নিয়েছিল বলে জানা গিয়েছিল, সেসব মানুষ কোথাও উবে গিয়েছে, যদিও হালকা হয়ে যাওয়া মামলা (কখনও শতাধিক আরও অভিযুক্তসহ) করা হয়েছে কয়েকজনের বিরুদ্ধে, আর অনেকের বিরুদ্ধে চলছে মামলা বাণিজ্য। আসল খুনিদের নিরাপদে পালাতে দিল কে? এই কথা যখন বাংলাদেশের সংবাদমাধ্যম ছাপতে পারে তখন ধরে নেব এদেশে মতপ্রকাশের স্বাধীনতা আছে। ধীরে হলেও হয়তো সে ক্ষেত্রে গণতন্ত্র আনাও সম্ভব হবে। তা না হলে সম্ভব না গণতন্ত্রের পথে সকলকে পৌঁছানো।

মানুষকে তাঁর কথাটা বলতে দিতে হবে এটি যেমন সত্যি, আবার কেউ এমন 'যা-তা' বলতে পারবেন না, যা অন্যের অধিকারকে ক্ষুণ্ন করে। যেমন কেউ যদি অনলাইনে একজন প্রান্তিকীকৃত জাতিগত বা ধর্মীয় বা লিঙ্গ পরিচয়ের মানুষের সম্পর্কে ভুল তথ্য দেয় বা ছড়ায় তাহলে সেটি শাস্তিযোগ্য হবে, কারণ ভুল তথ্য বা অপতথ্য ছড়িয়ে দেওয়াও অপরাধ! ভুল তথ্য বা মিস-ইনফরমেশন আর অপতথ্য বা ডিজইনফরমেশন দুই জিনিস হলেও উভয়েই নাগরিকের অধিকার ক্ষুণ্ন করতে ব্যবহৃত হতে পারে। ভুল তথ্য কেউ কেউ না জেনেও ছড়াতে পারেন। তবে অপতথ্য তৈরি করতে হয়, বিনিয়োগ লাগে। অপতথ্য প্রচার দণ্ডনীয়। আইনের শাসন থাকলে সে শাস্তি বিধানে আগের নিবর্তনমূলক আইন ব্যবহার না করে ভিন্ন আইনি ব্যবস্থায় যেতে হবে। ফলে মতপ্রকাশের অধিকার যদি অন্যের অধিকার হরণ করে, তবে সেটি অপরাধ হয়। পার্থক্যটা অনেক বড় না হলেও একেবারে কমও না।

ফ্রিডম হাউস ইনডেক্স (২০২৪) বলছে, বাংলাদেশ সাংবাদিকদের জন্য 'খুব সংকটপূর্ণ' একটি দেশ, যেখানে সংবাদমাধ্যমের স্বাধীনতা আংশিক। এর কারণ হয়তো এই যে, গত সরকারের আমলের নিবর্তনমূলক আইনগুলো, যেমন– আইসিটি আইন, ডিজিটাল নিরাপত্তা আইন বা সাইবার নিরাপত্তা আইনগুলো প্রণয়ন ও সেগুলোর নিপীড়নমূলক প্রয়োগ এমন এক পর্যায়ে পৌঁছে ছিল, যা ক্ষমতায় থাকা সরকার ছাড়া আর কাউকে নিরাপত্তা দেয়নি। বরং এ আইনগুলো দিয়ে নাগরিকের মতপ্রকাশের স্বাধীনতা হরণ এবং সংবাদমাধ্যমের কণ্ঠ রোধ করা হয়েছিল বছরের পর বছর। সামাজিক মাধ্যমে সরকারের যেকোনো সমালোচনা এসব আইনের বলে যে কাউকে জেলের ভাত খাওয়াতে পারত। আইসিটি আইনের ৫৭ ধারায় গ্রেপ্তার হওয়া আলোকচিত্রী শহিদুল আলমকে গুম করার চেষ্টায় ব্যর্থ সরকার তাঁকে জেলে রাখে ১০০ দিনের ওপরে আর ডিজিটাল নিরাপত্তা আইনে গ্রেপ্তার হওয়া লেখক মুশতাক আহমেদের কারা অভ্যন্তরে রহস্যজনক মৃত্যু হয়, কার্টুনিস্ট কিশোরকে সহ্য করতে হয় নানা মাত্রার শারীরিক ও মানসিক নির্যাতন।

এ আইনের কারণে নাগরিকদের সেলফ সেন্সরশিপ মাত্রা ছাড়ায়। আমরা দেখেছি, ফেসবুকে 'আসি না' লেখার 'অপরাধে' চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক মাইদুল ইসলামকে গ্রেপ্তার করে রিমান্ডে নেওয়া হয়েছে, সাবেক স্বাস্থ্যমন্ত্রী মোহাম্মদ নাসিমকে নিয়ে ফেসবুকে সমালোচনামূলক পোস্ট লেখার 'অপরাধে' রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক সিরাজুম মুনিরাসহ আরও অনেক নাগরিক জেল খেটেছেন। তারাসহ আরও অনেকে নানাভাবে বছরের পর বছর ধরে লাঞ্ছনা ও নিপীড়ন সহ্য করেছেন আওয়ামী রেজিমের। এসবের ফল হলো নাগরিকরা মতপ্রকাশে ভয় পেয়েছে, মাইদুলদের দৃষ্টান্ত তাদের অন্যায়ের বিরুদ্ধে মতপ্রকাশে নিরুৎসাহিত ও পরে চুপ করিয়ে দিয়েছে।

সংবাদ মাধ্যমের ওপরেও অনেক নিপীড়ন হয়েছে। আমার দেশ, দিগন্ত টিভিসহ বন্ধ হয়ে গেছে অনেক বিরোধী মতামতের সংবাদমাধ্যম। বাকি সংবাদমাধ্যম দশকের বেশি সময় ধরে ধীরে ধীরে সেলফ-সেন্সরশিপের মধ্যে ঢুকে গেছে। এ রকম একটা পরিবেশের মধ্যে মতপ্রকাশের বিরুদ্ধে সবচাইতে চরম নিপীড়ন নেমে আসে জুলাই অভ্যুত্থানের সময় যখন সারাদেশে ইন্টারনেট বন্ধ করে দেওয়া হয়। এসব ক্ষেত্রে নাগরিকের মানবাধিকার সবচাইতে বড় ক্ষতির শিকার হয়। ওই সময় টিভি চ্যানেলগুলো সরকারি প্রচারযন্ত্রে পরিণত হলেও কয়েকটি সংবাদপত্রের বস্তুনিষ্ঠ সংবাদ পরিবেশনের চেষ্টা থামায়নি। এ কারণে নাগরিকের তথ্য পাওয়ার উৎস হিসেবে সেগুলো আবার আস্থায় প্রতিস্থাপিত হয়।

অথচ সেই সব আস্থাভাজন সংবাদপত্রের মধ্যে দুটি অর্থাৎ প্রথম আলো ও ডেইলি স্টারের অফিসের সামনে যেভাবে কয়েক দিন ধরে সংঘবদ্ধ হিংস্র হামলা চালানো হয়েছে এবং সরকার যেভাবে সে আন্দোলন দমনে শক্তি ব্যবহার করেছে উভয়েই মতপ্রকাশের স্বাধীনতা এবং গণতান্ত্রিক মূল্যবোধের পরিপন্থি। যে কোনো সংবাদমাধ্যমের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ-বিক্ষোভ হতেই পারে। কিন্তু তারও একটা সীমা আছে। গরু জবাই, জেয়াফত, নামাজ পড়ে প্রতিবাদ ছাড়াও ধাক্কাধাক্কি করেছে আন্দোলনকারীরা আর সেনাবাহিনী এবং পুলিশ আন্দোলন দমন করেছে। রাজশাহীতে প্রথম আলোর অফিস ভাঙচুর হয়েছে, যা সবই গণতন্ত্রের জন্য অশনিসংকেত।

শুধু স্বৈরাচারী সরকারই মতপ্রকাশের স্বাধীনতা হরণ করে না, তার ব্যবস্থাও করে– এ কারণে আমরা স্বৈরাচারমুক্ত দেশেও দেখি ঢালাও অভিযোগে ১৬৭ সাংবাদিকের প্রেস কার্ড বাতিল করা হয়েছে, যা দেশের গণতান্ত্রিক চর্চার জন্য সুফল বয়ে আনবে না। এ ছাড়া বর্তমান অন্তর্বর্তীকালীন সরকারকে যেভাবে ইনডেমনিটি দিয়ে আইন করা হচ্ছে তাতে এ সরকারের কোনো কাজের সমালোচনা করলে জেলে যাবার আশঙ্কা তৈরি হচ্ছে। তাহলে আর কেন এত হাজার শিক্ষার্থী-জনতা প্রাণ দিলেন আর কেনই বা আমরা ফ্যাসিবাদ হটানোর লড়াইয়ে শামিল হলাম– যদি পাই নতুন বোতলে পুরোনো জিনিস! গণতন্ত্র ফেরত চাইলেই সেটি ফেরত চলে আসে না। গণতন্ত্র ফেরত আসে কেবল গণতন্ত্রের চর্চার মাধ্যমে আর কোনোভাবে না। গণতন্ত্র চর্চার মূল মাধ্যম হলো মুক্ত এবং স্বাধীন সংবাদমাধ্যম, যেখানে নাগরিকরা বস্তুনিষ্ঠ খবর পাবেন, সরকারের সমালোচনা পাবেন এবং নিজেরাও করতে পারবেন আর সে খবর প্রকাশের দায়ে কেউ সংবাদপত্র অফিস আক্রমণ করবে না, ভাঙচুর করবে না। ❖

ছবি :: মামুনুর রশিদ

শিক্ষক
সমাজবিজ্ঞান বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

10606

LABAID Diagnostics ...Home of Trust

দেশজুড়ে ৩২টি শাখা নিয়ে

ল্যাবএইড ডায়াগনস্টিকস

একই ছাদের নিচে সকল বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক ও রোগ নির্ণয়ের সবধরনের পরীক্ষা-নিরীক্ষা

সেই ১৯৮৯ সাল থেকে সকলের আস্থা হয়ে আছি

বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক ও সর্বাধুনিক প্রযুক্তির সাথে যুগোপযোগী চিকিৎসা পদ্ধতি এবং যোগ্য জনবল নিয়েই ল্যাবএইড ডায়াগনস্টিকস।

এরই ধারাবাহিকতা বজায় রাখতে ল্যাবএইড ডায়াগনস্টিকস প্রতিনিয়ত সংযোজন করছে বিশ্বের সর্বাধুনিক সব প্রযুক্তি, পাশাপাশি মানোন্নয়নের অব্যাহত যাত্রায় অর্জন করছে মূল্যবান দেশী ও আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি।

আমরা এখন বিশ্বের যেকোনো উন্নত ডায়াগনস্টিকস সেন্টারের সমকক্ষ। দেশের চিকিৎসা পদ্ধতি এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার এই প্রয়াসে আপনাদের আস্থাই আমাদের প্রধান অনুপ্রেরণা।

CAP ACCREDITED
COLLEGE of AMERICAN PATHOLOGISTS

দেশের প্রথম ডায়াগনস্টিক ল্যাবরেটরি হিসেবে **CAP** সনদপ্রাপ্ত

দেশের প্রথম **BAB** সনদপ্রাপ্ত

কেন আমরাই সেরা

■ দেশের সেরা ল্যাব কনসালটেন্ট
আমাদের ল্যাবরেটরিতে রয়েছে দেশের খ্যাতনামা ল্যাব বিশেষজ্ঞরা, যারা সার্বক্ষণিক সব ধরনের রিপোর্ট পর্যবেক্ষণ করেন।

■ ৩৫ বছরের অভিজ্ঞতা
৩৫ বছরের অভিজ্ঞতা নিয়ে দেশ/বিদেশে সুনামের সাথে কাজ করছে।

■ CAP -এর স্বীকৃতি
স্বাস্থ্য পরীক্ষায় প্রথম বাংলাদেশি ডায়াগনস্টিক ল্যাবরেটরি হিসেবে ল্যাবএইড অর্জন করেছে CAP Accreditation যা বিশ্বের অন্যতম কঠোর ল্যাবরেটরির মান পরীক্ষাকারী সংস্থার স্বীকৃতি।

■ BAB -এর স্বীকৃতি
আমাদের ল্যাব বাংলাদেশ অ্যাক্রেডিটেশন বোর্ড (বিএবি)-এর স্বীকৃতি লাভ করেছে।

■ টোটাল ল্যাব অটোমেশন (টিএলএ)
এখানে রয়েছে টোটাল ল্যাব অটোমেশন যার ফলে সম্পূর্ণ স্বয়ংক্রিয় রোবোটিক পদ্ধতিতে দ্রুত, সঠিক, সঙ্গতিপূর্ণ এবং সুনির্দিষ্ট নমুনা বিশ্লেষণ করে রিপোর্ট প্রস্তুত করা হয়।

■ মানসম্মত ল্যাব রিয়েজেন্ট
মান বজায় রাখার জন্য আমাদের ল্যাবে ব্যবহৃত ৯০% কেমিকেল ও রিয়েজেন্ট বিদেশের বিখ্যাত কোম্পানি থেকে সরাসরি আমদানি করা হয়।

■ বিশেষ বিভাগ
আমাদের আছে অত্যাধুনিক PCR ল্যাব, মলিকুলার অনকোলজি ও ফার্মাকোজেনেটিক ল্যাব, হিস্টোপ্যাথলজি/সাইটোলজি ল্যাব। এবং দেশের একমাত্র রেফারেন্স ল্যাব।

■ ২৪ ঘণ্টা সেবা প্রদান
২৪ ঘণ্টা খোলা। জরুরি সেবা ও রিপোর্ট দেয়া।

■ অনলাইনে রিপোর্ট ডেলিভারি
অনলাইনে প্যাথলজিক্যাল রিপোর্ট প্রদান।

মান নিয়ন্ত্রণ

- বিদেশে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত সার্বক্ষণিক বিশেষজ্ঞ ল্যাব কনসালটেন্ট দ্বারা মান পর্যবেক্ষণ করা হয়।
- BIO-RAD (USA) ও RANDOX (UK) এর সহযোগিতায় ISO 15189:2012 এর নির্দেশনা অনুযায়ী External Quality Control এবং Internal Quality Control দ্বারা পরীক্ষার ফলাফল এর মান নিয়ন্ত্রণ করা হয়।

ল্যাবএইড লিমিটেড (ডায়াগনস্টিকস) বাড়ি ১, রোড ৪, ধানমন্ডি, ঢাকা ১২০৫ | ওয়েব: www.labaiddiagnostics.com | ফোন: ০২-৪১০৬১৫০০-৯

গণঅভ্যুত্থানের খণ্ডচিত্র

ছবি :: এপি

ছবি :: মামুনুর রশিদ

ছবি :: মাহবুব হোসেন নবীন

ছবি :: জীবন আহমেদ

ছবি :: মোহাম্মদ পনির হোসেন, রয়টার্স

মতপ্রকাশ প্রসঙ্গে

১ পৃষ্ঠার পর

আগে নিয়ন্ত্রণ ছিল সরকারের। সরকার নিয়ন্ত্রণ করত আইন জারি করে পুলিশ ও আদালতের মাধ্যমে। সরকারের নিয়ন্ত্রণের বাইরে অন্য কোনো নিয়ন্ত্রণকে গুরুত্বপূর্ণ মনে করা হতো না। এখন সরকারি নিয়ন্ত্রণের বাইরে দেশি-বিদেশি নানা শক্তির দৃশ্যমান ও অদৃশ্য নিয়ন্ত্রণ অনেক বেশি। স্বাধীনভাবে চিন্তা করার এবং সুচিন্তিত মতপ্রকাশের সমস্যা ক্রমেই জটিল থেকে জটিলতর হচ্ছে। সমাধানযোগ্য সমস্যাবলির সমাধানের বিজ্ঞানসম্মত চিন্তা ও চেষ্টা বাংলাদেশে অল্পই আছে।

আমি লক্ষ করেছি, সামরিক শাসন ও জরুরি অবস্থার মধ্যেও অধিকাংশ সময়ে সর্বজনীন কল্যাণে মতপ্রকাশের সুযোগ ছিল। কিন্তু মূল্যবান মতই দেশে খুঁজে পাওয়া যেত না। প্রচারমাধ্যম ও রাষ্ট্রীয় শিক্ষাব্যবস্থা এখন সবচেয়ে বড় নিয়ন্ত্রক। আমি সর্বজনীন কল্যাণের পরিপন্থি নিয়ন্ত্রণের কথা বলছি, সব ধরনের নিয়ন্ত্রণ নয়। রাজনৈতিক দল, বৈদেশিক প্রণোদনাপুষ্ট বেসরকারি সংস্থা, অসহিষ্ণু জঙ্গিবাদী ধর্মীয় সংস্থা, চরমপন্থি উগ্রতা ও সন্ত্রাস সর্বোপরি ভোগবাদ-সুবিধাবাদ ইত্যাদির দ্বারা নানাভাবে স্বাধীন চিন্তাশীলতা ও প্রগতিশীল মতপ্রকাশ দারুণভাবে বিঘ্নিত হয়ে আসছে। শিক্ষাব্যবস্থা, স্কুল-কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়, গবেষণা সংস্থা, তথ্যপ্রযুক্তি ইত্যাদিও চিন্তার শুভকর বিকাশ, মত গঠন ও মতপ্রকাশের স্বাধীনতা খর্ব করে আসছে। জনগণ এসব মেনে চলছে। প্রতিবাদ ও বিকল্প সন্ধান অল্পই আছে।

চিন্তার ও মতপ্রকাশের সমস্যা নিয়ে যে আলোচনা আমরা করছি, তাতে মানুষের স্বরূপ, মানুষের প্রকৃতি, The nature of man, the concept of man, humanatic ইত্যাদি সম্পর্কে আমাদের যথাসম্ভব ধারণা অর্জন দরকার। বাংলা ভাষার আধুনিক যুগের লেখকদের লেখার মধ্যে মানবপ্রকৃতি ও মনুষ্যত্ব নিয়ে অনেকে আলোচনা করেছেন। রাজনৈতিক মহলে এ বিষয়ে অনুশীলনো, অনুসন্ধান ও বিচার-বিবেচনা দরকার। মানুষের বেলায় মন কী, তা নিয়েও বিজ্ঞানসম্মত আলোচনা-সমালোচনার মাধ্যমে জ্ঞান অর্জন করা দরকার। রাজনীতিই রাজনীতি– বিষয়ে, চিন্তার, মনমানসিকতা অর্জনের মূল বিষয়। তবে এ বিষয়ে পরিচ্ছন্ন ধারণা লাভের জন্য আনুষঙ্গিক অনেক বিষয়ের জ্ঞানও দরকার। রাজনীতি নিয়ে এ দেশে গভীর চিন্তাভাবনা কোনো কালেই করা হয়নি।

আমাদের বুঝতে হবে যে সকলেই চিন্তক নন, কেউ কেউ চিন্তক; নতুন চিন্তা, নতুন ভাব ও নতুন মত প্রকাশ করার তাগিদ চিন্তক-ভাবুকেরাই অনুভব করেন। চিন্তার স্বাধীনতা, মতপ্রকাশের স্বাধীনতা তাদের জন্যই দরকার। তাদের থেকেই আত্মপ্রকাশ করেন আবিষ্কারক, উদ্ভাবক ও সৃষ্টিশীল ব্যক্তিরা। তারা প্রতিভাবান ও সৃষ্টিশীল, তারা দার্শনিক, বৈজ্ঞানিক, জ্ঞানসাধক, আদর্শবাদী ও ধার্মিক। উন্নততর নতুন পৃথিবীর স্বপ্ন তারা দেখেন এবং সকলকে দেখান। চিন্তক ও ভাবুকদের চিন্তা ও কাজের দ্বারা সবাই উপকৃত ও লাভবান হন। কায়েমি স্বার্থবাদী ও হীন স্বার্থান্বেষীরা তাদের কাজকে ভয় পায়। মনে করে, সৃষ্টিশীল ও প্রগতিশীলদের চিন্তাও তাদের সম্পত্তি ও ক্ষমতার জন্য ক্ষতিকর হবে। গণজাগরণকে তারা ভয় পায়। এ জন্য তারা সৃষ্টিশীল ও প্রগতিশীলদের ওপর নিয়ন্ত্রণ চালায়। তাদের চিন্তার স্বাধীনতাকে খর্ব করে এবং নির্যাতন চালায়। ইতিহাসে এর দৃষ্টান্তের অভাব নেই। নির্যাতন ও নীতিকে অতিক্রম করে কিংবা মোকাবিলা করেই সৃষ্টি সম্ভব হয়েছে। এ ক্ষেত্রে জনসমর্থন অত্যন্ত ও গুরুত্বপূর্ণ। জনসমর্থন পেলে সৃষ্টিশীল মনীষা সফল হয়। স্বার্থের ব্যাপার আছে। অকারণে কেউ কারও চিন্তার স্বাধীনতায় বাধা দেয় না। সমস্যার প্রকৃতি সব দিক থেকে ভালো করে বুঝতে পারলে যথাযথ সমাধান সম্ভব হয়। রাজনীতিতে ও রাজনীতিবিদদের মধ্যেও সৃষ্টিশীল চিন্তা ও কর্ম দরকার। যারা সর্বজনীন কল্যাণে বড় কিছু করতে চেয়েছেন, করেছেন, তেমন রাজনৈতিক নেতাও রয়েছেন। আজকের বাংলাদেশে সে দিকটাতে গুরুত্ব দেওয়া দরকার।

প্রতিভাবান ও সৃষ্টিশীলরাও অভ্রান্ত হন না। ভুলত্রুটি সংশোধনের ও প্রগতির জন্য সমালোচনা অপরিহার্য। সমালোচনায় সকল পক্ষের মধ্যেই সত্যসন্ধ ও সত্যনিষ্ঠ দৃষ্টিভঙ্গি দরকার। রক্ষণশীল ও প্রগতিশীল শক্তি সমাজে থাকবেই। তাদের মধ্যে দরকার শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের নীতি। রক্ষণশীলরা শেষ পর্যন্ত প্রগতিশীলদের সঙ্গেই কাজ করেন। কিন্তু কায়েমি স্বার্থবাদীরা ও হীন স্বার্থান্বেষীরা প্রগতিবিরোধী, গণবিরোধী ধারায় অবস্থান নেয়।

বাংলাদেশের মানুষের ইতিহাস অত্যন্ত জটিল। এ দেশের রাজনীতি, জ্ঞান-বিজ্ঞান ও শিল্প-সাহিত্যের ইতিহাস সন্ধান করলে দেখা যায়, বিভিন্ন ঐতিহাসিককালে জনজীবনের বিরাট বিরাট সম্ভাবনা কীভাবে নষ্ট হয়ে গেছে নেতৃত্বের অভাবে। নেতৃত্ব ও সংঘশক্তি সৃষ্টিতে এ দেশের মানুষ প্রায় কোনো কালেই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারেনি। বিদ্রোহ বিভিন্ন সময়ে হয়েছে, সংগ্রামও হয়েছে; কিন্তু অভীষ্ট নেতৃত্বের অভাবে সর্বজনীন কল্যাণে সেগুলো কার্যকর হয়নি। সুশৃঙ্খল, উন্নতশীল বা প্রগতিশীল সমাজ ব্যবস্থা গড়ে ওঠেনি। স্বাধীন বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার পর গত তিপান্ন বছর কীভাবে কেটেছে?

শেখ মুজিবুর রহমান, খন্দকার মোশতাক আহমেদ, জিয়াউর রহমান, হুসেইন মুহম্মদ এরশাদ, খালেদা জিয়া, শেখ হাসিনা– এদের নেতৃত্বে বাংলাদেশ– বাংলাদেশের জনজীবন কেমন কেটেছে? রাষ্ট্র হিসেবে বাংলাদেশ কতটা গড়ে উঠেছে? এখন বাংলাদেশ রাজনীতিবিদদের হাতছাড়া হয়ে গেছে। যে উপদেষ্টা পরিষদ নিয়ে বাংলাদেশ চলছে, তার মধ্যে তো রাজনীতিবিদ নেই। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র যেভাবে বাংলাদেশ, বাংলাদেশের সরকার ও জনজীবন নিয়ে কথা বলছে, পরামর্শ দিচ্ছে, তা দেখে তো মনে হয়, বাংলাদেশ কোনো স্বাধীন রাষ্ট্র নয়। এটা যে কেবল এই উপদেষ্টা পরিষদের শাসনকালেই চলছে তা নয়; চলছে আরও অনেক আগে থেকে। বাংলাদেশের একটি জাতীয় পতাকা আছে, একটি জাতীয় সংগীত আছে, জাতিসংঘের সদস্যপদ আছে। কিন্তু স্বাধীনতা কি আছে? বাংলাদেশে কৃষি উৎপাদন, গ্যাস-তেল-কয়লা ইত্যাদি খনিজ সম্পদ আছে, মাটি-পানি-বাতাস ও সূর্যকিরণের প্রাচুর্য আছে, আয়তনে ক্ষুদ্র বটে, তবে জনসংখ্যা বড়। বাংলাদেশ তো পৃথিবীর সবচেয়ে সমৃদ্ধ, সবচেয়ে শক্তিশালী দশটি রাষ্ট্রের একটি হতে পারত! কিন্তু পারছে না কেন? বলা হয়েছে, বাংলাদেশের মানুষ খুব বেশি ঈর্ষাপরায়ণ, পরশ্রীকাতর, ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যপ্রিয়, আত্মকেন্দ্রিক, সংঘশক্তিহীন, অলস, কর্মবিমুখ। বলা হয়েছে, এ দেশের মানুষের প্রখর বুদ্ধি আছে বটে, তবে তারা তাদের বুদ্ধির খুব বেশি অপচয় করে। বলা হয়েছে, এ দেশের মানুষ গোটা ঐতিহাসিক কাল ধরেই অলস, কর্মবিমুখ, ভোগলিপ্সু। ১৯৭২ সাল থেকে পাঁচ-সাত বছর ধরে এসব কথা দেশি-বিদেশি জ্ঞানী-গুণী অনেক লোকে বলেছেন যে, এই মানুষদের নৈতিক চেতনা নিতান্ত দুর্বল, ইতিহাস চেতনা নেই ইত্যাদি। জাতীয়তাবাদী গণতান্ত্রিক আন্দোলন ও মুক্তিযুদ্ধের মধ্য দিয়ে বাংলাদেশ স্বাধীন রাষ্ট্ররূপে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

স্বাধীন বাংলাদেশের প্রথম দশকেই এসব কথা ক্রমাগত বলা হয়েছে। এই তিপান্ন বছরে বাংলাদেশ কি রাজনৈতিকভাবে উল্লেখযোগ্য কোনো উন্নতি করেছে? এখন অধ্যাপক ইউনূসের নেতৃত্বে গঠিত উপদেষ্টা পরিষদ কর্তৃক পরিচালিত হচ্ছে। এটা কোনো স্বাভাবিক অবস্থা নয়। আজ পর্যন্ত বাংলাদেশ জাতীয় সংসদের একটি নির্বাচন করার যোগ্যতাও অর্জন করেনি। এই সরকার রাষ্ট্র ব্যবস্থার সংস্কারের জন্য যে চেষ্টা চালাচ্ছে তার প্রতি জনগণের সম্মতি আছে। এই প্রচেষ্টা সফল হোক– এই কামনা করি। কিন্তু বাস্তবে দ্রব্যমূল্যের চাপে দেশের অন্তত অর্ধেক লোক চরম দুর্গতির মধ্যে আছে। একশ্রেণির ভদ্রবেশী দুর্বৃত্ত নানাভাবে লুটপাট চালিয়ে যাচ্ছে। নানা স্তরের দুর্বৃত্তরা দুষ্কর্ম চালিয়ে যাচ্ছে। এসব থেকে জনসাধারণকে রক্ষা করাও সরকারের কর্তব্য। ❖

ছবি :: মামুনুর রশিদ

সভাপতি
বাংলা একাডেমি

আশুগঞ্জ পাওয়ার স্টেশন কোম্পানী লিঃ
(বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ডের একটি প্রতিষ্ঠান)
(ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 & ISO 45001:2018)
সাশ্রয়ী বিদ্যুৎ উৎপাদন আগামীর নির্ভরতা

চলমান ইউনিট সমূহ (মেগাওয়াট)

* ৫০ মে.ও. গ্যাস ইঞ্জিন	- ৫৩.৬০
* ২২৫ মে.ও. সিসিপিপি	- ২২৫
* ২০০ মে.ও. মডুলার	- ১৯৫
* ৪৫০ মে.ও. সিসিপিপি (সাউথ)	- ৩৭৩.৩১
* ৪৫০ মে.ও. সিসিপিপি (নর্থ)	- ৩৮০
* ৪০০ মে.ও. সিসিপিপি (ইস্ট)	- ৪২০

চলমান প্রকল্প সমূহ

* পটুয়াখালী ১৩২০ মেগাওয়াট সুপার থার্মাল বিদ্যুৎ কেন্দ্র প্রকল্প এর জন্য ভূমি অধিগ্রহণ, ভূমি উন্নয়ন ও সংরক্ষণ প্রকল্প।
* রায়পুরা ১২০ মেগাওয়াট গ্রিড-টাইড সোলার পাওয়ার প্ল্যান্ট প্রজেক্ট।

1647 MW

রেজিস্টার্ড অফিসঃ আশুগঞ্জ, ব্রাহ্মণবাড়িয়া-৩৪০২
কর্পোরেট অফিসঃ নাভানা রহিম আর্ডেন্ট (লেভেল-৮),
১৮৫, শহীদ সৈয়দ নজরুল ইসলাম সরণী, বিজয় নগর, ঢাকা-১০০০
02-58317634-5, apscl@apscl.org.bd, www.apscl.gov.bd

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম

১০ বছরে সমকাল

আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন

উত্তরা মেট্রোরেল স্টেশন থেকে পায়ে হাঁটা দূরত্বে

উত্তরা ভিউতে

নিষ্কণ্টক জমিতে চলছে প্লট বুকিং!

প্রকল্পের সুবিধা সমূহ:

এখনই বাড়ি নির্মাণ উপযোগী বাউন্ডারীকৃত রেডি প্লট।
প্রকল্পে রয়েছে রয়েছে খ্যাতনামা ৮টি বিশ্ববিদ্যালয়ের স্থায়ী ক্যাম্পাস।
ঢাকা আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর থেকে মাত্র ১০ মিনিটের দূরত্ব।
প্রকল্পের ঠিক অপর পাশেই রয়েছে রাজউক উত্তরা মডেল টাউন।

নিশ্চিত ভবিষ্যৎ গড়তে সপরিবারে আবাসন প্রকল্পটি দেখে আসুন আমাদের ব্যবস্থাপনায়-

বিস্তারিত জানতে: ০১৭৬৬-৬৬৫১৬৯, ০১৭৫৫-৫৮২২৬৭

AMLDL

আমিন মোহাম্মদ ল্যান্ডস্ ডেভেলপমেন্ট লিমিটেড
(আমিন মোহাম্মদ গ্রুপ-এর একটি সদস্য প্রতিষ্ঠান)
কর্পোরেট অফিস: ৭৫২ সাতমসজিদ রোড, ধানমন্ডি, ঢাকা-১২০৫, ফোন: ৫৮১৫৫১০১-৫।
aminmohammadlands aminmohammadlands aminmohammadlands AminLands www.amldlbd.com

স্ক্যান করুন

NRB Bank

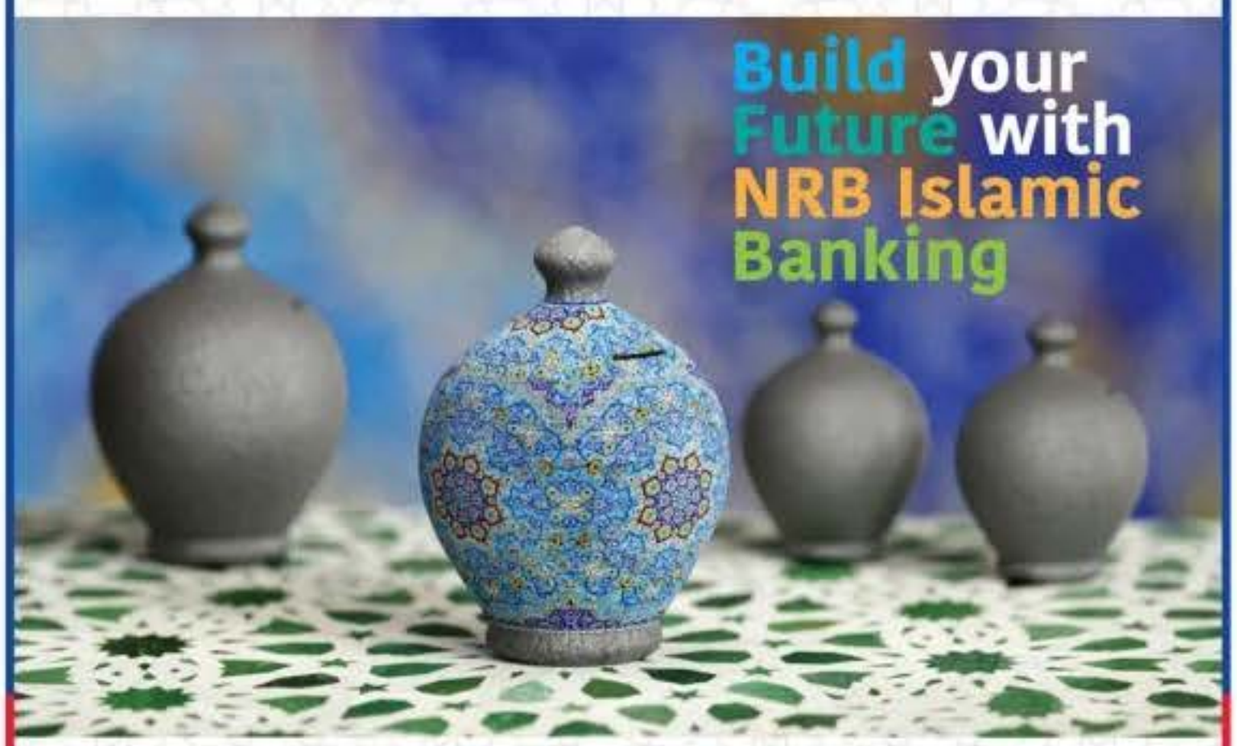

Al-Wadeeah Current Account
Shariah Based Current Account

Mudaraba Short Notice Deposit Account
Shariah Based General Transaction Account For Individual And Corporate Organizations

Mudaraba Savings Account
Shariah Based General Transaction Account For Non-Trading Customers

Mudaraba My NRB Savings Account
Shariah Based Special Savings Account For Non-Resident Bangladeshi

Mudaraba Women Account
Shariah Based Special Savings Account For Women

Mudaraba Senior Citizen Account
Shariah Based Special Savings Account For Bangladeshi Citizens Aged 50 And 50+

Mudaraba Payroll Account
Shariah Based Account For Corporate Institutions to Disburse Salary

Mudaraba Monthly Profit Deposit Scheme Account
Shariah Based Monthly Profit Paying Scheme Account

Mudaraba Term Deposit Account
Shariah Based Profit Bearing Term Deposit Account

Mudaraba Deposit Pension Account
Savings Scheme On Monthly Instalment Basis Based On Islamic Shariah

Mudaraba Hajj Savings Scheme
Monthly Savings Scheme To Build Up Fund For Meeting Hajj Related Expenses And Perform The Holy Hajj

Mudaraba Bibaho Savings Scheme
Savings Scheme To Build Up Fund For Meeting Marriage Expenses

Perpetual Cash Waqf Account
Shariah Based Ongoing Sadakah Account

Temporary Cash Waqf Account
Shariah Based Temporary Sadakah Account

24 HOURS CALL CENTER 16568
www.nrbbankbd.com
www.facebook.com/nrbbankbd

evercare
HOSPITAL DHAKA
Transforming Healthcare

এভারকেয়ার হসপিটাল ঢাকা
জেসিআই স্বীকৃতি অর্জন করলো টানা ৬ষ্ঠ বার

এভারকেয়ার হসপিটাল ঢাকা, ২০০৮ সাল থেকে গত ১৬ বছরে একটানা ৬ বার, জেসিআই স্বীকৃতি অর্জন করেছে, যা রোগীর নিরাপত্তা নিশ্চিতকল্পে সেবার গুণগত মান বজায় রেখে বিশ্বমানের স্বাস্থ্যসেবা প্রদানের প্রতি আমাদের প্রতিশ্রুতির নিদর্শন।

জেসিআই (স্বাস্থ্যসেবায় শীর্ষস্থানীয় যুক্তরাষ্ট্রভিত্তিক স্বীকৃতিদাতা) মানসমূহ রোগীর নিরাপত্তা ও স্বাস্থ্যসেবার গুণগত মান নিশ্চিতকরণের জন্য আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত একটি শীর্ষস্থানীয় প্রোগ্রাম।

এভারকেয়ার হসপিটাল ঢাকা
প্লট-৮১, ব্লক-ই, বসুন্ধরা আ/এ, ঢাকা-১২২৯, বাংলাদেশ
ফোন: +৮৮ (০২) ৮৪৩১৬৬১-৫, ই-মেইল: info@evercarebd.com
www.evercarebd.com

১০৬৭৮

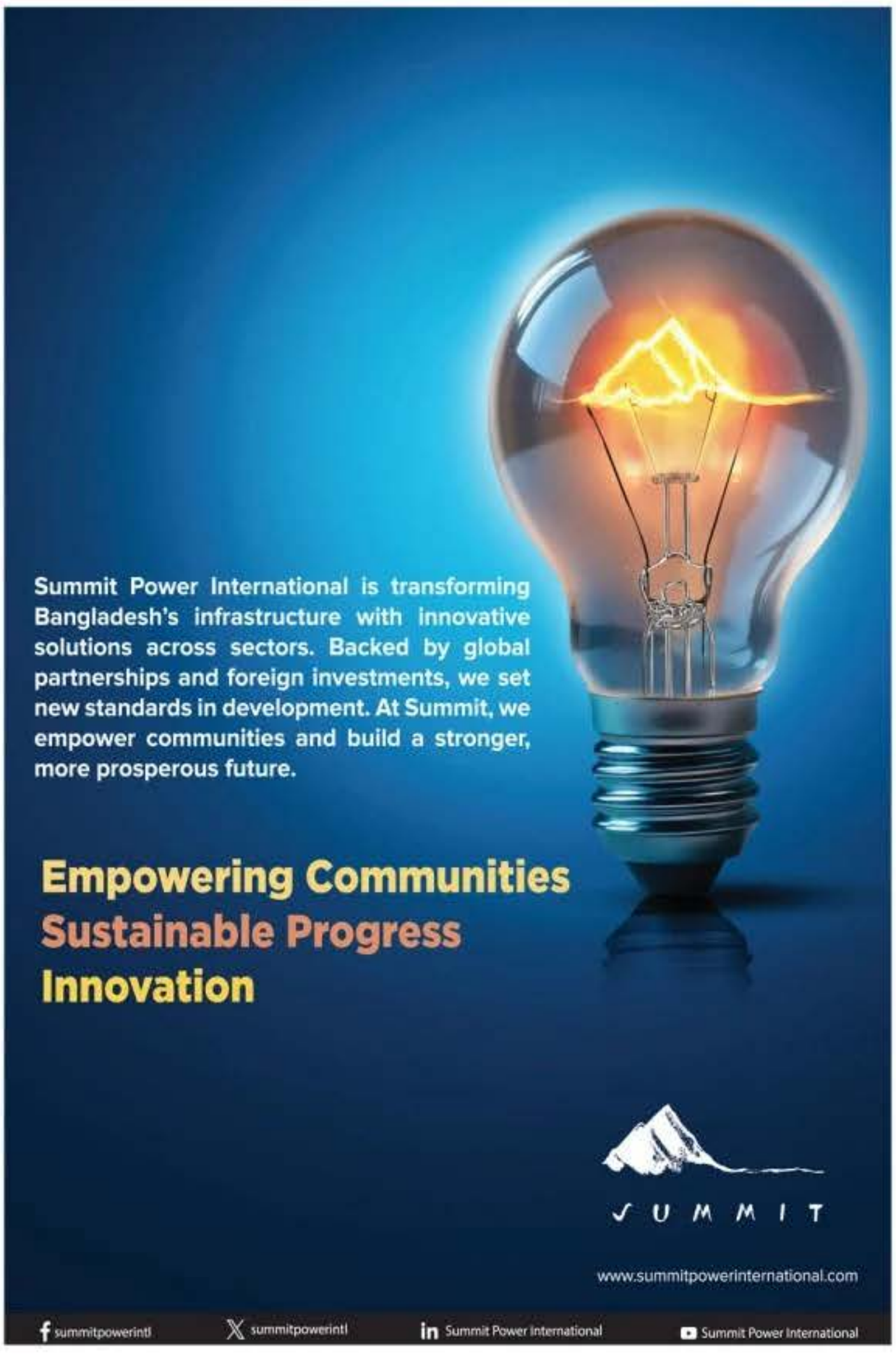

Summit Power International is transforming Bangladesh's infrastructure with innovative solutions across sectors. Backed by global partnerships and foreign investments, we set new standards in development. At Summit, we empower communities and build a stronger, more prosperous future.

Empowering Communities
Sustainable Progress
Innovation

SUMMIT

www.summitpowerinternational.com

summitpowerintl | summitpowerintl | Summit Power International | Summit Power International

সমকাল-এর
২০ বছরে পদার্পণে
প্রাণঢালা
অভিনন্দন

প্রবাসী (NRB) ও স্বদেশীদের বিনিয়োগে বাংলাদেশের বৃহৎ আবাসন প্রকল্প

রাজউক পূর্বাচল ৩০০ ফিট রাস্তার শেষ প্রান্তে
জাইকা অর্থনৈতিক অঞ্চলের বিপরীতে

পূর্বাচল **প্রবাসী পল্লী**

বিস্তারিত জানতে ঃ- ০১৯২৬৬৮৪৮৬৩
০১৪০৯৯৫৯৩৩০

প্রবাসী পল্লী গ্রুপ
প্রবাসী ও স্বদেশীদের জন্যে

কর্পোরেট অফিস ঃ- আহমেদ টাওয়ার, (লেভেল-১২), ২৮ ও ৩০ কামাল আতাতুর্ক এভিনিউ, বনানী, ঢাকা-১২১৩।
email-info@probashipalligroup.com web-www.probashipalligroup.com

সম্ভাবনার
এক নতুন
ঠিকানা
জলসিঁড়ি
আবাসন
SHELTECH
16550

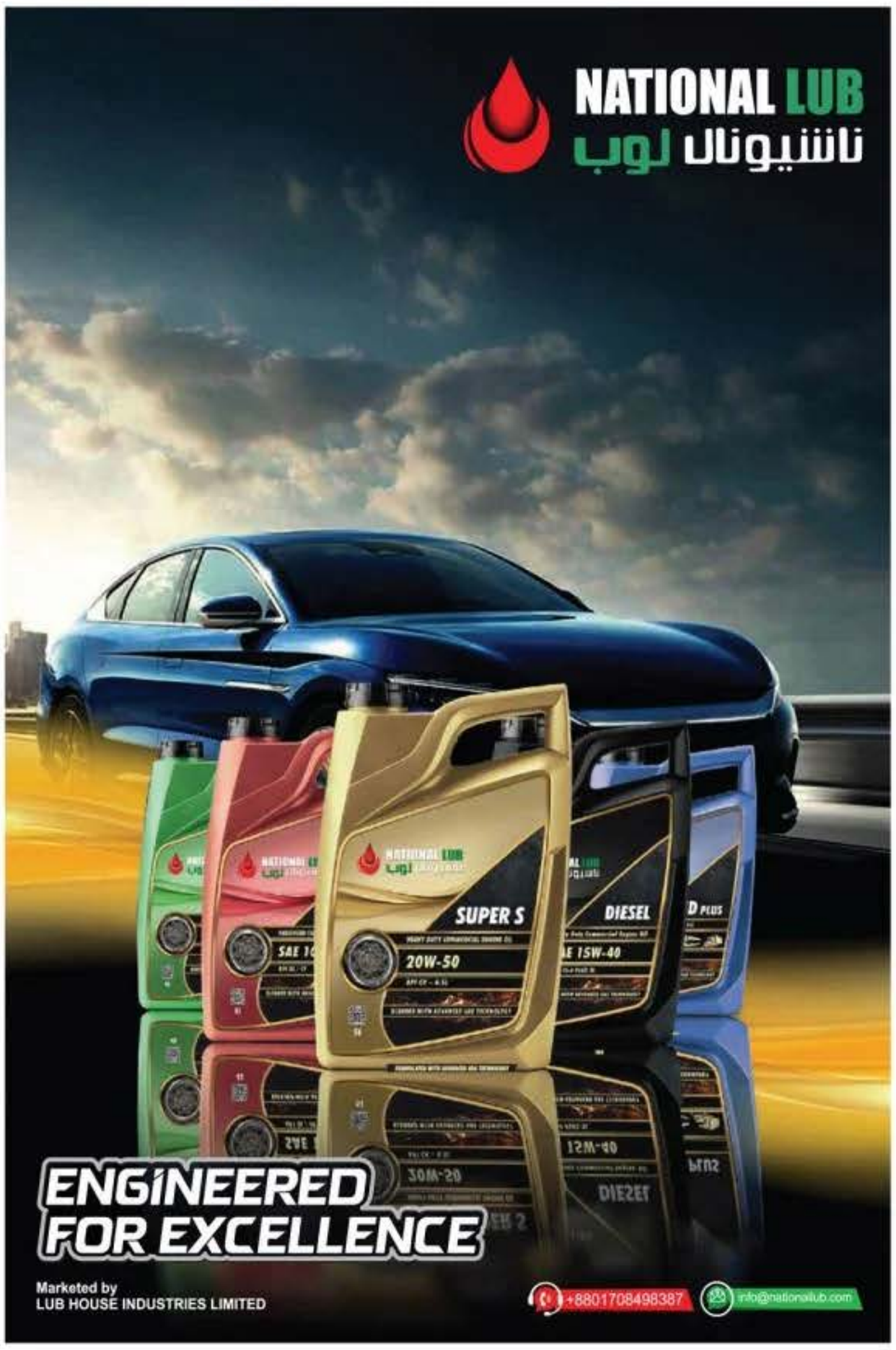

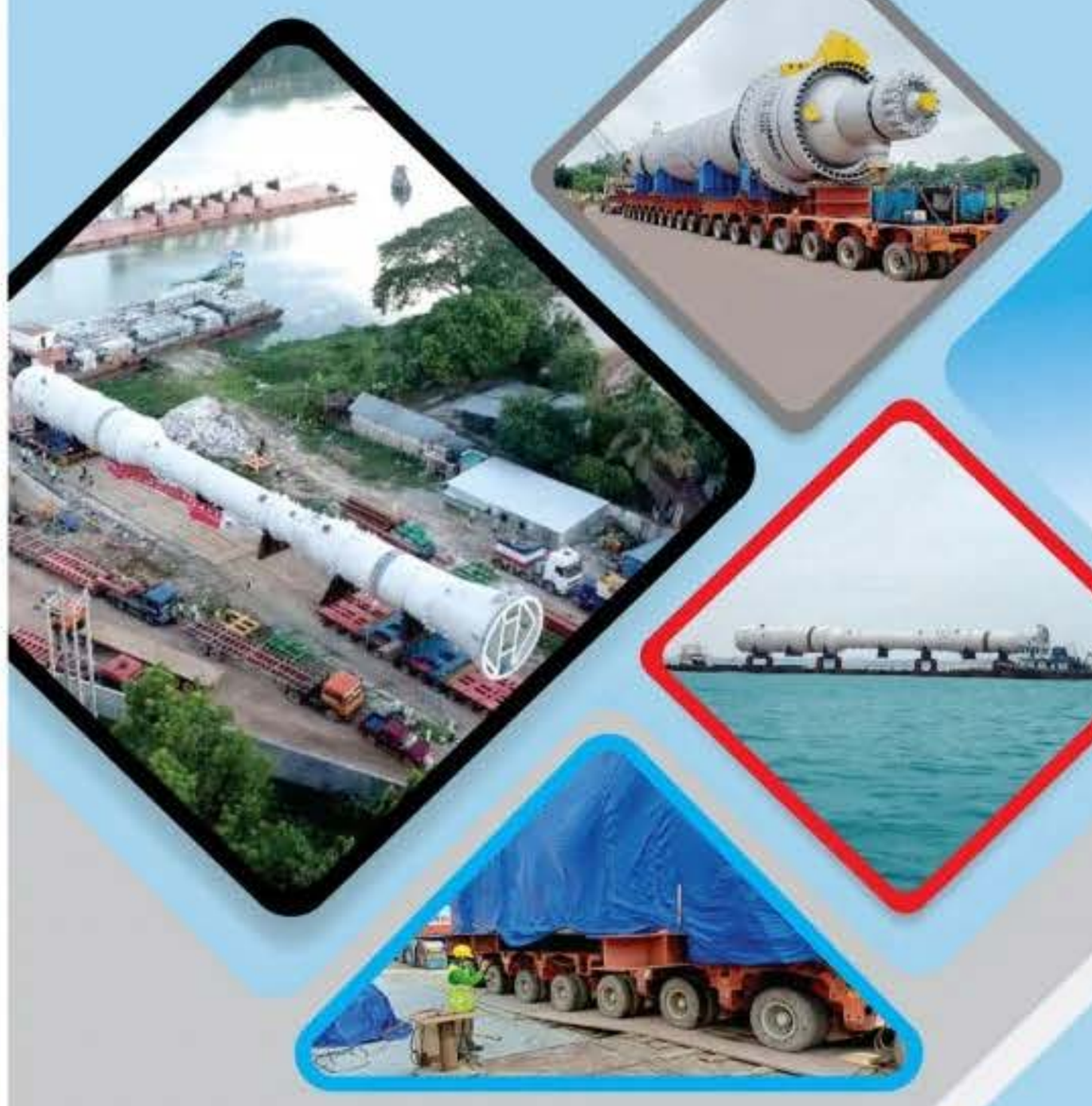

NATIONAL LUB
ناشيونال لوب
SUPER S
20W-50
DIESEL
ENGINEERED FOR EXCELLENCE
Marketed by
LUB HOUSE INDUSTRIES LIMITED
+8801708498387
info@nationallub.com

AMMS LOGISTICS
SHIPPING AGENT & LOGISTIC SERVICES
RADIANT SHIPPING LIMITED
SHIPPING & CLEARING FORWARDING AGENT
SS ENTERPRISE
COMMISSION AGENT & SUPPLIER
Awarded & Trusted Logistic Partner in Bangladesh
Chittagong Office: Lokman Tower (3rd, 6th & 7th Flr) Sk. Mujib Road
Chowmohani, Chittagong-4100, Bangladesh.
Phone (Office): +880-31-2517034-36, 2519336 Fax: +880-31-2519335
Web: www.ammslogistics.com, Email: homeartgec@gmail.com, ammsint@gmail.com

TOUCHING LIVES
to the Power of Cure
BEACON®
Light for life

৫ আগস্ট ২০২৪ : প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে গণঅভ্যুত্থানজয়ী ছাত্র-জনতা

ছবি :: এএফপি

৩৬ জুলাই গানের সুরে

২৪-এর গণঅভ্যুত্থানে রাজপথে ছাত্র-জনতার অপ্রতিরোধ্য সম্মিলনের স্মারক হয়ে আছে সেই সময়ে রচিত কিছু গান। তিনটি গান পত্রস্থ হলো–

আওয়াজ উডা বাংলাদেশ

হান্নান

আওয়াজ উডা বাংলাদেশ, আওয়াজ উডা বাংলাদেশ
রাস্তায় এত রক্ত কাগো আওয়াজ উডা
আওয়াজ উডা বাংলাদেশ, আওয়াজ উডা বাংলাদেশ
রাস্তায় গুল্লি করল কেডা
আওয়াজ উডা বাংলাদেশ

আমরা বলে রাজাকার কয় দি দেশের রাজা কার?
ছাত্র আওয়াজ না উডাইলে দেশের ভিত্রে হাহাকার
গদিত বইসে স্বৈরাচার কত কিছু সইয়া আর
তর পজিশন টিক্কা থাকব কত ভাই ক মইরা আর

নামছি বুকে পতাকা দেশ বেচতাছস কয় টেকা?
সিলেট যহন ডুইব্বা গেসে পানি আইছে কই থেইকা?
আবু সাঈদরে গুল্লি করলি অর্ডার দিল কই থেইকা?
এবার রাস্তায় লাখো সাঈদ কইলজা থাকলে ঠেকাগা!

আমার বইন যে মাইরা দিলি, তর ঘরেরটা মারতি তুই?
তর না দেইখ্যা মাইরা দিলি, নিজের ওইলে পারতি তুই?
হকের কেউ খাইয়া লাইলে, এমনে কি আর ছাড়তি তুই?
একটা মারবি দশটা পাডাম, আর কয়ডারে মারবি তুই!

শহীদ হইল আবু সাঈদ এরপর গেল আসিফও
রাফি গেল তারও পরে গেল ওয়াসিম-আদনানও
সোনার বাংলা রয়া যাইব, সোনার ছেলে বান্দা গো
কাপুরুষের পরিচয় তগো কইলজা রাখছি মাপ দা গো

ছাত্র ছাড়া লীগ হয় নাই তর লীগের কামডা ঠিক হয় নাই
স্বাধীন বাংলা কইছে খালি, বাংলা আর স্বাধীন হয় নাই
দেশটা যে কারও বাপের একা ওর বাপে কয়া যায় নাই
হের বাপে যা কইরা গেছে ওর ভিত্রে এডি রয়া যায় নাই

যেই বুকে কালকে মেডেল ঝুলব ওই বুকে আজকে গুল্লি কে
কথা হইল মুর্দার দেশে ন্যায়ের আওয়াজ তুলবি কে
বায়ান্নরটা ভুলতারি নাই চব্বিশেরটা ভুলবি কে
শিক্ষার মাজা ভাঙবি তাইলে স্কুল-কলেজ খুললি কে!

বাঙালি তো বোকা ভাই আমরা পায়ে পায়ে ধোঁকা খাই
এত বছর চুইষ্যা খাইছোস পরের পাঁচেও তরে চাই
ঘরের সন্তান যে ঘরে নাই এই চিন্তা আপায় করে নাই
কত ঝড় যে আইল-গেল চেয়ার আপার লড়ে নাই

না কোনো লীগের আমরা, না আইছি কোনো দলেরতে
নামছি রাস্তায় কাফন মাথায় টাইন্না আনুম তলেরতে
সাঈদ, আমি গুল্লি লমু হাসিমুখে নলেরতে
স্টুডেন্ট গো আওয়াজ দাবা, কমান্ড আইসে দলেরতে?

আওয়াজ উডা বাংলাদেশ, আওয়াজ উডা বাংলাদেশ
রাস্তায় এত রক্ত কাগো আওয়াজ উডা
আওয়াজ উডা বাংলাদেশ, আওয়াজ উডা বাংলাদেশ
রাস্তায় গুল্লি করল কেডা
আওয়াজ উডা বাংলাদেশ

পারশা

ভুলে যাই আমি, ভুলে যাও তুমি, ভুলে যাক পুরো জাতি;
কিভাবে মানুষ মরেছে অকালে, কিভাবে কেটেছে রাতি।
আমি ভুলে যাই, কিভাবে বুলেট ছিদ্র করেছে মুগ্ধকে;
তুমি ভুলে যাও, আবু সাঈদের বিশ্বাসে ভরা বুকটাকে।
জাতি ভুলে যাক, কালোরাত আর স্মরণ করুক রেলটাকে;
চলে যাক নেট, নিভে যাক জাতি, হায়নাতে যাক দেশটাকে।
চলো ভুলে যাই চোখে দেখা খুন
ধরে নেই ওটা নাটক ছিলো,
ধরে নেই সব ঠিকঠাক এমন,
কত রাজাকার আসলো গেলো।
কত ফাইয়াজ প্রিয় জাফর আহাদ
পলকেই যায় হারিয়ে,
বেঁচে থাকো তুমি, বেঁচে থাকি আমি;
লাশের উপরে দাঁড়িয়ে।
চলো দেখে নেই, বাতাবী লেবু লটকনে দেশ ছাড়িয়ে;
চলো কেঁদে ফেলি, ফ্লাইওভার আর মেট্রোরেলটা জড়িয়ে।
মূল্যবোধের রক্তক্ষরণ আকাশ থেকেই করুক,
মায়োপিক জাজে মুখ চেপে ধরে উপস্থাপিকা মারুক।
আমার শ্মশান বাংলা ভালো নেই আজ,
তবু তাকে আমি ভালোবাসি;
দুনিয়াতে পাই নরকের স্বাদ,
বাংলা মা আজ বানভাসি।
গোঁ ধরে থাকুক, আরোশের মানুষ আঁকড়ে থাকুক গদি,
পরে কোনো গানে ফিরবো আবার, এই প্রাণটা থাকে যদি!

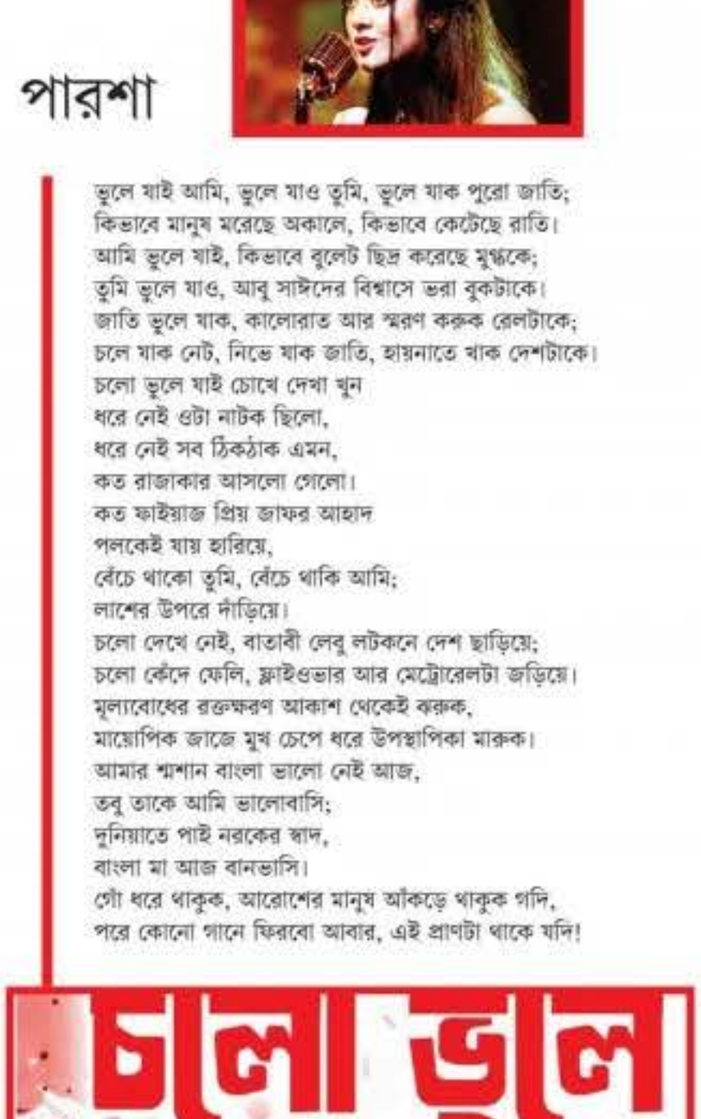

কথা ক

সেজান

এই, বায়ান্নরতে চব্বিশে তফাত কই রে? কথা ক
দ্যাশটা বলে স্বাধীন তাইলে খ্যাচটা কই রে? কথা ক
আমার ভাই-বইন মরে রাস্তায় তর চেষ্টা কই রে? কথা ক
কালসাপ ধরসে গলা প্যাঁচায়, বাইর কর সাপের মাথা কো?

জোর যার, মুল্লুক তার! আগে ক, মুল্লুক কার?
লাঠির জোরে কলম ভাঙ্গে, শান্তির নামে তুলল খার
কাইল মারলি, পরশু মারলি, মারতে আইলি আজ আবার!
রাজায় যহন প্রজার জান লয় জিগা তাইলে রাজা কার?

আমার মানচিত্র কান্দে আইজকা দেইখ্যা দ্যাশের হাল রে
লাল-সবুজের পতাকা, মা, পুরাডাই দেহি লাল রে
তলোয়ার হইয়া কাটে যাগো হওয়ার কথা ঢাল রে
পাপের জিহ্বায় সইতারে না উচিত কথার ঝাল রে

এইত্তোর দালালের মায়রে– মাইরা দ্যাশের বাইরে
দলের ভাইয়ের শেল্টার লইয়া মারস নিজের ভাইরে
যহন দ্যাশ বেইচ্চা ক্যাশ করস, দ্যাশপ্রেম যায় কই তর?
মাইরা যাগোর মাথা ফাডাস– মারতি হইলে বইন তর?

মাইয়া-পোলা ফ্রন্টলাইনে, অনলাইনেও সিনডা
টোকাই ঘুরে চাক্কু হাতে, ঠোল্লা চুড়ি পিন্দা
মারতে আইলে মাইরা দিবি, মুর্দা নাইলে জিন্দা
রাইত দেইখা ডরাইস না কেউ, রাইতের পরেই দিনডা

নিজের ভাইয়ের গোস্ত খাস বিবেকের তলপেডে পোঁচ মাইরা,
যারা তুলে আওয়াজ অগো টিটকারি দেস পোষ্ট মাইরা
ছাত্র দিসে ভাষা আইন্যা, দ্যাশ বানাইসে ছাত্ররা
যেই হাতে কলম-খাতা ওই হাতে দেস হাতকড়া

মুক্তির লেইগা যুদ্ধ কইরা মুক্তিডাই তর মিলল কই?
ভাষার লেইগা লইড়া যদি বোবা হইয়াই পইড়া রই!
এই বেডা যুক্তি কই? মিঠা মিঠা যত উক্তি কই?
দ্যাশের মেরুদণ্ড ভাঙতে যাইয়া নিজের কবর নিজে খুঁড়বি ওই!

দেশ গড়ার সবক দিয়া কামের সময় সইরা যাস!
কার রক্তে পাড়া দিয়া বিজয় মিছিল কইরা যাস?
মায়ের বুক খালি কইরা রঙ্গের মহল গইড়া যাস?
যা, বাঁইচ্চা থাক; খালি জানি ভিত্রেরতে মইরা যাস

জবান খুললেই জবান সিলাই, আর সিলাইব কয়জনের
একজনে মা পইড়া গেলেও খাড়ায় যাইব ছয়জনে
জন্ম লইসি মরতে মরার ডর দেহাইস না আমাগো
এক সেজানে মরলেও লাখো সেজান কইব, কথা ক

বায়ান্নরতে চব্বিশে তফাত কই রে? কথা ক
দ্যাশটা বলে স্বাধীন তাইলে খ্যাচটা কই রে? কথা ক
আমার ভাই-বইন মরে রাস্তায় তর চেষ্টা কই রে? কথা ক
কালসাপ ধরসে গলা প্যাঁচায়, বাইর কর সাপের মাথা কো?

SCIMAGO INSTITUTIONS RANKINGS 2022
ONE University in Bangladesh

SOUTHEAST UNIVERSITY
Meeting the Challenges of Time

Undergraduate Programs

BBA, LLB, BA in Bangla, BA in English, BSS in Economics, EEE, Textile Engineering, CSE, Architecture, Pharmacy

Master's Programs

MBA, EMBA, LLM, MA in Bangla, MA in English, MDS

A CENTRALLY LOCATED MAGNIFICENT CAMPUS AWAITS YOU

Permanent Campus
252 Tejgaon, Dhaka 1208

01766348518
01632261081

www.seu.edu.bd
seu.official.info

SCAN ME

INTERNATIONAL COLLABORATION
SCHOLARSHIPS & CAMPUS JOBS
PROFESSIONAL ACCREDITATIONS

স্ট্যান্ডার্ড ব্যাংক পিএলসি.
শরি'আহ্ ভিত্তিক পূর্ণাঙ্গ ইসলামি ব্যাংক

শরিয়ার আলোকে আলোকিত সমৃদ্ধি

সকল সূচকে অগ্রগতির ধারা বজায় রেখে দৃঢ় আর্থিক ভিত্তির উপর দাঁড়িয়ে
শরি'আহ্ ভিত্তিক পূর্ণাঙ্গ ইসলামি ব্যাংক, স্ট্যান্ডার্ড ব্যাংক পিএলসি.।
আপনার কষ্টার্জিত অর্থের সুরক্ষা ও প্রবৃদ্ধি নিশ্চিত করতে
আমরা সবসময়ই প্রতিশ্রুতিবদ্ধ ও অবিচল।

এক নজরে আমাদের ব্যবসায়িক প্রবৃদ্ধির চিত্র

www.standardbankbd.com

শান্তিতে শ্বাস নেবে এ বিশ্ব আবার

প্লাস্টিকমুক্ত ব্যাগ কিনুন
এটি বহুবার ব্যবহারযোগ্য
পৃথিবী বাঁচাতে এগিয়ে আসুন

সপ বন

ছবি :: এপি

১ পৃষ্ঠার পর

এখন আমাদের যে উপদেষ্টা সরকার রয়েছে, তারা আমাদের এই অভিপ্রায়, এই আকাঙ্ক্ষা পূরণ করতে পারবে না। যদি পূরণ করতে না পারে, তাহলে বিশৃঙ্খলা থাকবে, সমাজে বিভিন্ন সমস্যা-সংকট প্রকট হতে থাকবে। ফলে এই বিষয়টা আমাদের আগে মীমাংসা করতে হবে।

● ১৯৭২ সাল থেকে বাংলাদেশ রাষ্ট্রের একটি সংবিধান রয়েছে। ২০২৪ সালের ৫ আগস্ট গণঅভ্যুত্থানের পর সংবিধান সংশোধন, পুনর্লিখন বা নতুনভাবে প্রণয়নের বিতর্ক সামনে আসছে। রাষ্ট্র গঠনের বিষয়টি এর সঙ্গে যুক্ত। এর মীমাংসা কীভাবে সম্ভব?

●● আমি কখনও 'সংবিধান' শব্দের ব্যবহারই করি না। এটি একটি ঔপনিবেশিক শব্দ। আমি আপনাকে শাসন করতে চাই, আপনি সংবিধান লিখবেন। কারা লিখবে এই সংবিধান– যারা তথাকথিত এলিট শ্রেণি; গণতন্ত্রে তো এটি হতে পারে না। সংবিধান প্রণয়ন করা হলো একটি প্রক্রিয়া। এর বিপরীতে আমি ব্যবহার করি 'গঠনতন্ত্র'। তার মানে, বাংলাদেশ রাষ্ট্র গঠন করতে হবে। আর গঠন করা প্রক্রিয়া অবশ্যই জনগণকে নিয়ে করতে হবে। আপনি হাওয়ায় একটা জিনিস লিখে দিলেন, আর জনগণ তাতে 'হ্যাঁ' বলে দেবে, তা হবে না। একটি নির্বাচন করলেন, সেখানে গণপরিষদে পাস হয়ে যাবে– এটিকে গঠনতন্ত্র বলে না। আপনাকে প্রথমত জনগণের সঙ্গে কথা বলতেই হবে। এর কোনো বিকল্প নেই। যেমন– সনাতন ধর্মাবলম্বীদের একটি বক্তব্য থাকতে পারে বাংলাদেশ গঠনের ক্ষেত্রে। আপনি কি তাদের বক্তব্য শুনবেন না? প্রান্তিক কৃষক, জেলেদের কথা কি আপনি শুনবেন না? আপনি কি শ্রমিকের কথা শুনবেন না? আপনি কি সংবিধান প্রণয়ন করবেন ঢাকা শহরের কয়েকজন শিক্ষিত এলিটকে নিয়ে? এটি তো চলবে না। শব্দটা 'গঠন'; আর সেই গঠনতান্ত্রিক প্রক্রিয়ার সঙ্গে আপনাকে সমাজের বিভিন্ন স্তরের মানুষকে অংশগ্রহণের শর্ত তৈরি করতে হবে। তারা যেন কথা বলতে পারে, নিজেদের অভিপ্রায় ব্যক্ত করতে পারে, তার জন্য বিভিন্ন রকম সভা-সমিতি, মিটিং, আলোচনা সভা করতে হবে। যে আলোচনা সভাগুলোকে আমি বলছি, গঠনতান্ত্রিক কাউন্সিল। গঠনতন্ত্র প্রণয়নের জন্য জনগণের পরামর্শ। আপনাকে গ্রাম পর্যায় থেকে ইউনিয়ন, সেখান থেকে উপজেলা, উপজেলা থেকে জেলা, সেখান থেকে বিভাগ, বিভাগ থেকে শহর– সমস্ত পর্যায়ে আপনাকে একটি গঠনতান্ত্রিক কাউন্সিল করতে হবে। জনগণকে জিজ্ঞাসা করতে হবে– একটি গণঅভ্যুত্থান ঘটেছে; আর সেখানে আপনি নায়ক। এবার বলেন, আপনি কী ধরনের বাংলাদেশ চান। ফলে সংবিধান সংশোধন, পুনর্লিখন এগুলো একদম অবান্তর তর্ক। আপনাকে অবিলম্বে সমাজের বিভিন্ন স্তরে গঠনতান্ত্রিক কাউন্সিল গঠন করতে হবে; সেখানে জনগণকে কথা বলতে দিতে হবে এবং সেখান থেকে এর পরিপ্রেক্ষিতে জনগণের অভিপ্রায় হাজির করতে হবে।

● বর্তমান রাজনৈতিক ব্যবস্থায় দুর্বৃত্তায়ন ও অর্থনীতিতে লুটপাট ওতপ্রোতভাবে জড়িত। এ থেকে কীভাবে বের হওয়া সম্ভব?

●● আমি গঠনতান্ত্রিক কাউন্সিলের কথা বলেছি। সেখানে লোকজন দুর্নীতির বিরুদ্ধে নিজেরাই প্রতিষ্ঠান তৈরি করবে। এ ক্ষেত্রে বর্তমান সরকারের কাজ হলো দুটি– যারা ইতোমধ্যে অর্থসম্পদ লুট করে নিয়ে গেছে বিদেশে, সে টাকা ফিরিয়ে আনার ব্যবস্থা করা এবং দ্বিতীয় কাজটা হলো– যাতে লুট হতে না পারে, তেমন একটি রাষ্ট্র গঠন করা। এমন একটি রাষ্ট্র যদি আমরা গঠন করতে চাই, তাহলে প্রথম কাজ হলো একটি গঠনতন্ত্র প্রণয়ন করা– কোন গঠনতান্ত্রিক নিয়মে, বিধিবিধান দিয়ে আদর্শগতভাবে আমরা সম্পদ পাচার রোধ করতে চাইছি। এজন্য গঠনতান্ত্রিক কাউন্সিল গঠন করা খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

● অন্তর্বর্তী সরকারের প্রথম তিন মাসের কর্মকাণ্ড কীভাবে মূল্যায়ন করবেন?

●● আমি প্রথম থেকেই বলে আসছি এই অন্তর্বর্তীকালীন সরকার একটি দুর্বল সরকার। তাই এদের মূল্যায়ন করাটা ঠিক হবে না। কারণ, আমি ধরেই নিয়েছি যে, এদের পক্ষে খুব ইতিবাচক ভালো কিছু করা সম্ভব নয়। এই দুর্বল সরকার শুধু টিকে আছে সেনা-সমর্থনের কারণে। তার কাছ থেকে আমি যৌক্তিকভাবে কিছু প্রত্যাশা করি না। তাই তাকে মূল্যায়ন করাটা অন্যায় হবে, অবিচার হবে। আমি বরং চেষ্টা করব যে সরকার যেন টিকে থাকে। সমালোচনা করব; কিন্তু এমন কোনো সমালোচনা করব না যেন এ সরকার আরও দুর্বল হয়ে পড়ে।

● বিভিন্ন পক্ষ থেকে রাজনৈতিক ও নির্বাচনী সংস্কারের কথা বলা হচ্ছে। বিএনপি অন্তর্বর্তী সরকারের কাছে রোডম্যাপ (রূপরেখা) চেয়েছে। সরকারের পক্ষ থেকে যৌক্তিক সংস্কারের পর নির্বাচনের কথা বলা হচ্ছে। আপনার মতে, যৌক্তিক সংস্কার কোনটা বা কতটুকু?

●● আমি 'সংস্কার' শব্দটা খুব একটা পছন্দ করি না। এসব শব্দের মাধ্যমে আমরা বিভ্রান্ত করছি জনগণকে। 'গঠন' মানে কিন্তু 'সংস্কার' নয়। গঠন মানে নতুন করে গড়ে তোলা। আমরা যখন গঠন করার কথা বলছি, তখন আমরা নতুন করে গড়ার কথা বলছি। তারা 'সংস্কার' করার কথা বলছেন। কীভাবে সংস্কার করবেন? একটা বাড়ি আমি বানাইনি; সেখানে আবার কিসের সংস্কার? আমরা তো রাষ্ট্র গঠনই করিনি। সবার আগে রাষ্ট্র গঠনের দিকে নজর দিতে হবে। আমরা রাষ্ট্র গঠনের প্রতি মনোযোগ দিইনি; শুধু সরকারের কথা বলছি। এখানে সরকার তো গুরুত্বপূর্ণ নয়। প্রথম হলো– জনগণের ক্ষমতা, এরপর জনগণের ক্ষমতার মধ্য দিয়ে গাঠনিক যে শক্তি গড়ে ওঠে সেটি ভালো করে বুঝতে পারা এবং সেই গাঠনিক ক্ষমতার জোরে রাষ্ট্রকে নতুন করে গড়ে তোলা। এটিই সাধারণ প্রক্রিয়া। বুদ্ধিমান লোকেরা সহজেই এটি বুঝবেন। এখানে সংস্কারের কিছু নেই। আমাদের সবকিছু নতুন করে গড়তে হবে। বাড়ি বানানোর ক্ষেত্রে যেমন আমার ভাবতে হবে এটি লোহার গাম হবে, নাকি পাথরের গাম; একইভাবে রাষ্ট্র বানানোর ক্ষেত্রেও ভাবতে হবে– একটি শক্তিশালী কাঠামো গঠনের জন্য তাহলে আমার কী কী জিনিস লাগবে। এ জিনিসগুলোর মধ্যে প্রথমেই

'গণঅভ্যুত্থানই গণতন্ত্র'

থাকবে একটি অর্থনৈতিক সুরক্ষা এবং প্রাণ-প্রকৃতি-পরিবেশ সুরক্ষার ব্যবস্থা করা। তারও আগে দরকার ব্যক্তিস্বাধীনতা, ব্যক্তির মর্যাদাহানি যেন না হয় তার ব্যবস্থা করা। প্রথমত, আপনাকে বলতে হবে– রাষ্ট্রে ব্যক্তির অধিকার, ব্যক্তির মর্যাদা হরণ করে এমন কোনো আইন রাষ্ট্র করতে পারবে না। দ্বিতীয়ত, প্রাণ-প্রকৃতি-পরিবেশ বিপর্যয় করে এবং প্রাণের বৈচিত্র্য ধ্বংস করে এমন আইন বা নীতি রাষ্ট্র প্রণয়ন করতে পারবে না। তৃতীয়ত, বাংলাদেশের জনগোষ্ঠীকে বাইরের আক্রমণ থেকে সুরক্ষা করা এবং ভেতরের নিরাপত্তা, অর্থাৎ বিভিন্ন রকম অন্তর্ঘাতী কর্মকাণ্ড থেকে সুরক্ষা নিশ্চিত করা। এগুলো আমাদের গঠনতন্ত্রে থাকতে হবে। এটাই তো সংবিধান– চার পৃষ্ঠার সংবিধান। আমাকে আগে এটি চিন্তা করতে হবে– কীভাবে সারমর্ম করব; সারমর্ম করার মধ্য দিয়ে সবাই যেন বুঝে এর মানে কী। তার মানে এ রাষ্ট্রে সবাই হবেন স্বাধীন; শুধু যে কাজগুলো প্রাণ-প্রকৃতি-পরিবেশের ক্ষতি করে, তা নিষিদ্ধ। নিষিদ্ধ– যদি আপনি মাটি, পানি, বায়ু দূষিত করেন; অথবা অন্যের জীবন-জীবিকার ক্ষতি করেন। মোটা একটি বই বানানোর দরকার পড়ে না। কোন কোন আইন ও নীতি সরকার করতে পারবে ও পারবে না; এটি বলা থাকলেই তো একটি সংবিধান হয়ে যায়– এক, দুই বা চার পাতার সংবিধান।

আমরা যেহেতু মোটা একটি সংবিধান দেখেছি; মনে হতে পারে আমাদের বুঝি এমন একটি গঠনতন্ত্র করতে হবে। তা করার দরকার নেই। এরপর আপনি আলোচনা করতে পারেন আমাদের রাষ্ট্রের রূপরেখা কেমন হবে– রাষ্ট্রপতি শাসিত হবে; নাকি সংসদীয় পদ্ধতির হবে। বাংলাদেশে তো তা বেছে নেওয়ার সুযোগও জনগণকে দেওয়া হয়নি। আমি কেন ব্রিটেনের কাঠামো গ্রহণ করব; এর কোনো যুক্তি নেই। বাংলাদেশের জনগণ তো নতুন কোনো কাঠামো গ্রহণ করতেই পারে– যুক্তরাষ্ট্রের মতো রাষ্ট্রপতি শাসিত কাঠামোও তো আমরা গ্রহণ করতে পারি! কেন আমাদের পুরোনো সংবিধান মাথায় রাখতে হবে? আমাদের নতুনভাবে চিন্তা করার ক্ষেত্র তৈরি করতে হবে। এজন্যই আমি বারবার 'গঠন'-এর কথা বলছি। লোককে কথা বলতে দিন; নতুন আইডিয়া দিতে দিন। মানুষকে যখন নতুন আইডিয়া দিতে দেবেন; সে নিজে আবিষ্কার করবে। এজন্য আমাদের বিকেন্দ্রীকরণ দরকার। কয়েক দিন আগে নগরায়ণ নিয়ে এক সভায় আমি দাবি রেখেছি, নতুন বাংলাদেশ গড়তে হলে ঢাকা শহর ভাঙতে হবে। এই ঘিঞ্জি শহর একটা বস্তি; এই বস্তি রেখে কি আমি নতুন বাংলাদেশ গড়তে পারব? তারপর নতুন নগরায়ণ চিন্তাও লাগবে। তার মানে গঠনতন্ত্রের পর সবকিছু নতুন করে গড়তে হবে। সেখানে নগরায়ণ আসবে, পানি ব্যবস্থাপনা আসবে, ভূমি ব্যবস্থাপনা আসবে, আরও অনেক কিছু আসবে; কিন্তু সেটি আসবে নীতিগত, আদর্শিক জায়গা থেকে। এটি শুধু আইনি ব্যাপার না। বাংলাদেশ নদীবাহিত দেশ। ঢাকা শহরের মাঝখান দিয়ে যদি একটি খাল বয়ে যায়, তাহলে ক্ষতি কী? ওই খাল আমাদের যানবাহনের জন্য কাজে লাগবে। এ ছাড়া বহুরকম কাজে লাগবে। এমন ব্যবস্থায় পয়ঃপ্রণালি, বর্জ্য ব্যবস্থাপনাও ভিন্ন হবে। কত কিছু করতে হবে! রাষ্ট্র গঠন তো সহজ কোনো বিষয় নয়। নগরায়ণের ক্ষেত্রে এমন সিদ্ধান্তও হতে পারে– চাষের জমি ও বনে কোনো বসতি স্থাপন করা যাবে না।

● বিগত সরকারের আমলে সম্ভবত বাকস্বাধীনতা ও গণতন্ত্রে সবচেয়ে বড় আঘাত এসেছিল ...

●● বাকস্বাধীনতা হরণ করার কোনো অধিকার রাষ্ট্রের থাকবে না। যখন আমরা ব্যক্তিস্বাধীনতার কথা বলি, তখন একই সঙ্গে বাকস্বাধীনতা, চিন্তার স্বাধীনতা এসে যাচ্ছে। আলাদা করে বলার প্রয়োজন পড়ে না। আর বিগত রেজিমকে আমরা ফ্যাসিস্ট শক্তি বলছি। ফ্যাসিস্ট মানে হলো– শুধু সে বলবে, অন্য কারও বলার অধিকার থাকবে না। অন্যের কথা বলার অধিকারকে সে ডিজিটাল নিরাপত্তা আইন, সাইবার নিরাপত্তা আইন, প্রেস অ্যান্ড পাবলিকেশন আইন– এমন বহু আইনের মাধ্যমে সে মানুষের কণ্ঠ রুদ্ধ করছে। আবার আমরা যখন ব্যক্তির মর্যাদার কথা বলছি; তখন অপরের মর্যাদা রক্ষার দায়িত্বও আমাদের। স্বাধীনতা মানে যা খুশি তা করার স্বাধীনতা না। ব্যক্তিস্বাধীনতা মানে সমাজে থেকে ব্যক্তির স্বাধীনতা। ব্যক্তি ততটুকু স্বাধীনতা ভোগ করবে; যতটুকুতে সমাজ ক্ষতিগ্রস্ত না হয়। অন্যের অধিকার আপনি হরণ করছেন না; এটি যতক্ষণ আপনি নিশ্চিত করতে পারবেন, ততক্ষণ আপনি এ স্বাধীনতা ভোগ করতে পারবেন। কারণ, আপনি যদি সমষ্টির স্বাধীনতা ক্ষুণ্ন করেন, সমষ্টির ক্ষতি করেন; তাহলে সমষ্টির সুরক্ষার জন্য আপনার ওপর কিছু বিধিনিষেধ আসতেই পারে। আপনি যাকে-তাকে গালি দিতে পারবেন না; আপনি কাউকে অমর্যাদা করতে পারবেন না; এটি নীতিগতভাবে পালন না করলে আইন করে বাধা দিতে হবে। স্বাধীনতা অবারিত নয়। সমাজের রীতি, নীতি, মূল্যবোধের মধ্য থেকে আপনাকে স্বাধীনতা ভোগ করতে হবে। স্বেচ্ছাচার হলো ব্যক্তিতন্ত্র; আর ব্যক্তিতন্ত্র আর ব্যক্তিস্বাধীনতার মধ্যে যে পার্থক্য আছে, তা বজায় রাখতে হবে। এর দায়িত্ব তৃতীয়পক্ষ হিসেবে রাষ্ট্রকে নিতে হবে। আন্তর্জাতিক সব মানবাধিকার আমাদের মানতে হবে। আমাদের এমন কোনো আইন করা যাবে না, যা আন্তর্জাতিক মানবাধিকারের সঙ্গে অসংগতিপূর্ণ। শুধু গণহত্যা না, পরিবেশ রক্ষা, খাদ্য, শিক্ষা, চিকিৎসা– এসবই মানবাধিকারের মধ্যে পড়ে। মানবাধিকার মানে শুধু গুম-খুন এগুলোর বিষয় বলছি, তা না কিন্তু; বরং বিভিন্ন মানবাধিকার সনদ বাস্তবায়নও রাষ্ট্রের কাজ।

● এবারের গণঅভ্যুত্থানে নারীর অভূতপূর্ব অংশগ্রহণ ছিল। অথচ পরবর্তী সময়ে তাদের সেভাবে দেখা যায়নি ...

●● গণঅভ্যুত্থানে নারীর যে নেতৃত্ব ছিল, তাকে অবহেলা করা হয়েছে। শুধু অবহেলা নয়, আমি বলব তাদের অপমান করা হয়েছে। নারীকে অবশ্যই নেতৃত্বের মধ্যে আসতে হবে। এটি ভালো দিক যে, আমরা অন্তর্বর্তীকালীন সরকারে বেশ কয়েকজন নারী উপদেষ্টাকে দেখতে পাচ্ছি। কিন্তু আন্দোলনে যে নারীরা ছিলেন, তাদের সত্যিকার অভিপ্রায়ের যারা প্রতিনিধিত্ব করতে পারতেন, তাদের আরও সম্পৃক্ত করা দরকার ছিল। এ ছাড়া সামাজিক-রাজনৈতিক বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে তাদের প্রতিষ্ঠিত করা দরকার ছিল। আমি এখনও পর্যন্ত বড় কোনো প্রতিষ্ঠানের দায়িত্বে কোনো নারীকে বসাতে দেখিনি। তরুণ নারী নেতৃত্বের বিকাশের জন্য যে সহায়তাটুকু দরকার, রাষ্ট্রের যে সহযোগিতা দরকার; তা আমি দেখছি না। আমি দেখছি, আন্দোলনে সেভাবে নারীর স্বীকৃতি প্রতিষ্ঠিত হয়নি; সেই সঙ্গে নারীকে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করার জন্য প্রাতিষ্ঠানিক, রাজনৈতিক, সামাজিক শর্তগুলো আমাদের সমাজে অনুপস্থিত।

● সামনের দিনে বাংলাদেশের ভূরাজনীতি কেমন দাঁড়াতে পারে?

●● বাংলাদেশ ইতোমধ্যে এক অভূতপূর্ব নাড়া দিয়েছে বিশ্বব্যাপী। এর ফল আমরা পাব– যদি আমি যে কথাগুলো বলছি তা মনোযোগ সহকারে কেউ শোনে ও বাস্তবায়ন করার চেষ্টা করে। নতুন বাংলাদেশ গড়ে তোলার মানে হলো– ভূগোল, পরিবেশ, প্রকৃতি, প্রাণ-বৈচিত্র্য– এই সবকিছু আমলে নিয়ে একটি আন্তর্জাতিক সম্পর্ক রচনার চেষ্টা করা। আমাদের সম্পদ রক্ষা করা এবং সে কথা মাথায় রেখে বিভিন্ন রকম শক্তির সঙ্গে আমাদের বোঝাপড়া পরিষ্কার করা। সেই শক্তিগুলো হলো– নতুন বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি, এ প্রযুক্তি আমদানির ক্ষেত্রে আমাদের অবশ্যই বিভিন্ন দেশের সঙ্গে সংযোগ রাখতে হবে। ভূরাজনীতি মানে শুধু সামরিক বা রাজনৈতিক বিষয় নয়; ভূরাজনীতিতে অর্থনীতিও বেশ গুরুত্বপূর্ণ। আমি জোর দেব– আমরা যেন অর্থনীতি ও প্রযুক্তিগত দিকে ভূরাজনীতিকে বেশি নিবিষ্ট রাখি। আমাদের খুব দ্রুত উন্নতি দরকার; খুব দ্রুত যেন আমাদের পঙ্গু অর্থনীতিকে বিকশিত করতে পারি, সে অনুযায়ী ব্যবস্থা নিতে হবে। অর্থনীতি বিকাশের আলোকে আমাদের ভূরাজনীতি নির্ধারণ করতে হবে। যে দেশের মাধ্যমে আমাদের অর্থনৈতিক বিকাশ দ্রুত হবে, সেই দেশের সঙ্গেই মৈত্রী হবে। সেখানে প্রযুক্তিগত দিক থেকে আমরা কতটা উন্নত হতে পারছি, সেটিও দেখতে হবে। ইউরোপসহ বিভিন্ন দেশে আমরা মানবসম্পদ পাঠাতে পারি, তাদের যে সেখানে স্থায়ীভাবে থাকতে হবে, এমন নয়। আমরা পাঁচ বছর বা নির্দিষ্ট সময়ের জন্য দক্ষ জনশক্তি পাঠাব; সময় শেষে তারা চলে আসবেন। এমন চুক্তি তো আমাদের হতেই পারে। এর মধ্য দিয়ে আমাদের বৈদেশিক মুদ্রা যেমন আসবে, তেমনি প্রযুক্তির আদান-প্রদানও হবে। আগামী দিনে প্রযুক্তি আয়ত্ত করার বিষয়টি হবে আমাদের কেন্দ্রীয় বিষয়। আবার এমন প্রযুক্তি আমরা চাই না, যা আমাদের প্রাণ-পরিবেশের ক্ষতি করে। যেমন– বায়োটেকনোলজি চাই; কিন্তু জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং আমি চাই না। পর্যালোচনার ভিত্তিতে নতুন প্রযুক্তি গ্রহণ করতে হবে।

● আঞ্চলিক ক্ষেত্রে ভারত একটা বড় শক্তি। বিভিন্ন সময়ে আমরা ভারতের পক্ষ থেকে সরকারকে চাপে ফেলার কথা শুনে থাকি। আপনি সরকারকে দুর্বল বলছেন ...

●● আপনি যদি মনে করেন ভারত আমাকে দুর্বল শক্তি আকারে হাজির করেছে; তাহলে এর সমাধান করেন। আপনি ভারত বিরোধিতার কথা বলতে পারেন, কারণ ভারত আমাদের জন্য একটা বড় চ্যালেঞ্জ। কিন্তু আরেক দিকে থাকা মিয়ানমারও তো কম বড় চ্যালেঞ্জ নয়। আমাদের দু'দিকেই তো শত্রু। তাদের মোকাবিলা করার জন্য আপনি আগে নিজের চিন্তাকে স্থির করেন। আপনি এখনও 'সংস্কার' নিয়ে পড়ে আছেন; আপনি ভারতকে মোকাবিলা কীভাবে করবেন? গণপ্রতিরক্ষা ব্যবস্থায় বাধ্যতামূলক সামরিক শিক্ষা জরুরি। এ সরকার এসেই বলতে পারত, আমাদের বাধ্যতামূলক সামরিক শিক্ষা লাগবে। যে ছাত্ররা আন্দোলন করেছে, তাদের সবাইকে সেনাবাহিনীতে ঢুকতে হবে। এমন কিছু তো তারা বলেনি। এগুলো না করতে পারলে আপনি ভারতকে মোকাবিলা করবেন কীভাবে। যে কাজে অগ্রাধিকার দেবেন, সে কাজটি সবার আগেই করতে হবে। একটি সুশৃঙ্খল জনসম্পদ গড়তে আপনাকে অবশ্যই দুই বছর বাধ্যতামূলক সামরিক প্রশিক্ষণ নিতে হবে। এই সামরিক শিক্ষার মধ্য দিয়ে সে মানবসম্পদ আকারে গড়ে উঠছে। সমাজের অগ্রগতি, অর্থনৈতিক উন্নতির জন্য সে ভূমিকা রাখতে পারবে। তা না হলে তো সে মিছিল-মিটিং করে বেড়াবে। এ কাজটি করার জন্য আপনার একটি পরিকল্পনা লাগবে।

● দেশের গণতন্ত্রের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে আপনার মতামত জানতে চাই।

●● আমি খুবই আশাবাদী। গণঅভ্যুত্থানই গণতন্ত্র। আমাদের আগে গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র কায়েম করতে হবে। আর গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রেরই শুধু ভবিষ্যৎ আছে। আর কারও কোনো ভবিষ্যৎ নাই। ফ্যাসিবাদের কোনো ভবিষ্যৎ আছে কি? নাই। গণতন্ত্রেরই ভবিষ্যৎ আছে। তবে গণতন্ত্র বলতে আমরা কী বুঝি, এটি নিয়ে আলোচনা করতে হবে। জনগণের অভিপ্রায় যেন আপনি প্রকাশ করতে পারেন, তার ব্যবস্থা করতে হবে। জনগণ কী চায় তা সে বলুক। সে নিজেই নিজের ভাগ্য বদল করুক। সেই পরিস্থিতি তৈরি করুন। দেখবেন, সবকিছু বদলে যাবে।

● নতুন কোনো রাজনৈতিক দলের মধ্য দিয়ে কি জনগণের সেই অভিপ্রায় প্রকাশ পেতে পারে?

●● জনগণের অভিপ্রায় যদি কোনো রাজনৈতিক দল ধারণ করতে না পারে, তাহলে সেই রাজনৈতিক দল সফল হবে না। নতুন রাজনৈতিক দল মানেই জনগণের রাজনৈতিক অভিপ্রায় ধারণ করতে সমর্থ রাজনৈতিক দল। এর বাইরে কোনো রাজনৈতিক দল জনগণের আস্থা পাবে না। জনগণের অভিপ্রায় ধারণ করেই কেবল কোনো রাজনৈতিক দল ইতিবাচক ভূমিকা রাখতে পারে। এর বাইরে শুধু ক্ষমতায় যাওয়া আর লুটেরা হওয়ার জন্য আরেকটা রাজনৈতিক দলের দরকার নেই আমার। তবে জনগণের এই অভিপ্রায় যখন একবার হাজির হয়ে গেছে, তখন এই অভিপ্রায় ধারণ করে কোনো রাজনৈতিক দল আগামী দিনে আসবেই।

● সমকালকে সময় দেওয়ার জন্য আপনাকে ধন্যবাদ।

●● আপনাকেও ধন্যবাদ। ❖

ইতিহাসের দেশে

১ পৃষ্ঠার পর

তবে এটা সাম্প্রতিক বিষয় নয়। এই ভাবনার সূত্র যখন থেকে আমরা 'রাজা' বা 'রাষ্ট্র' শব্দকে বলতে শিখেছি তখন থেকেই। এটার সাথে ক্ষমতায় যাওয়া বা থাকার সম্পর্ক ঘনিষ্ঠ।

৩.

প্রাচীন ইতিহাস নিয়ে আমরা সরলভাবে বলি, শশাঙ্ক, পাল, সেন, তুর্ক-আফগান শাসন ইত্যাদি। এরা সবাই ছিল আমাদের শাসককুল, কিন্তু সেই সময়ের পাবলিক কী ভাবত সেটা বলি না, কারণ আমরা জানি না। এদের অনেকের সূত্র উত্তর ভারত বা আরও দূরের রাজনীতি বা অর্থনীতি। এমনকি 'বাংলাকে' আমরা এই বরেন্দ্র, রাঢ় অঞ্চলে সীমাবদ্ধ করে রাখি অনেক ক্ষেত্রে। আমরা শুনি 'বাংলার' প্রথম স্বাধীন রাজা শশাঙ্ক। সে কে? কেন "স্বাধীন"। আগে পরাধীন থাকলে, কার অধীনে ছিলাম? আমার শুনলাম 'মাৎস্যন্যায়' নামের কালের কথা যখন চারিদিকে নাকি ছিল অনাচার, জিঘাংসা, মারপিট, রাজায় রাজায় খুনাখুনি, মানুষে মানুষে হানাহানি। কীভাবে জানলাম? এত রাজা এলো কোথা থেকে? পালদের নাম পেলাম লামা তারানাথ নামের এক বৌদ্ধ ভিক্ষু যে পালদের সমর্থক ছিল তার পুঁথি থেকে। এটা কি বাংলার বাস্তব অবস্থা ছিল, না দূরের উত্তর ভারতের? সাধারণ মানুষের কথা আছে ওই বইতে? পালরা রাজা হলো কী করে? কে বানাল? অনেকদিন শুনতাম, সামন্তরা সবাই ভোট দিয়ে তাদের রাজা করে। কেউ কোনো প্রমাণ দিয়েছে? না। তারানাথ লিখেছেন, আমরা বলেছি। আমাদের এটা ভাবতে বলতে সুবিধা হয়, গর্ব হয়, তাই বলেছি। পালদের গুরুর ইতিহাস খুঁজে পাইনি বলে এটা মানতে সহজ হয়েছে অনেকের জন্য।

৪.

পালদের আমরা ভক্ত বৌদ্ধ বানালাম অথচ তারা শৈব ধর্মের বিরাট প্যাট্রন ছিল। দুইটা ধর্ম একসাথে? আরও নজির আছে? যদি থাকে তার মানে তো ধর্মের সুবিধা নেওয়া। অশোকও হয়তো তাই করেছে। পালদের কালে যে বৌদ্ধ মঠ ছিল, তাদের সাথে খুব ভালো সম্পর্ক ছিল রাজাদের। সেটা ধার্মিক না রাজনৈতিক সম্পর্ক, এখনও টেক্সট বইতে পড়াই না। কিন্তু এখন গবেষকরা বলেন এটা দুই পক্ষের সুবিধার ও সুযোগ গ্রহণের ব্যবস্থা। অর্থাৎ রাজনীতি ও রাজ্য চালনায় অনেক কিছু প্রয়োজন হয়, আজ হয়, তখনও হতো।

৫.

কিন্তু আরও মজার হলো যে আমরা বলতে ভুলে যাই, পাল-সেনরা ছিলেন উত্তর ভারতের রাজনীতির নিকটের বরেন্দ্র অঞ্চলে, যেটা পূর্ব ও দক্ষিণ বাংলার নয়। সেখানে দশম শতাব্দী থেকে রাজত্ব করে চন্দ্রবংশ; যাদের রাজপিতা ছিল হরিকেল রাজা, যেটা বার্মায় অবস্থিত। তাদের উপস্থিতি ছিল আরও আগে থেকে। এদের সাথে দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার সম্পর্ক ঘনিষ্ঠ ছিল, উত্তর ভারতের চেয়ে। অর্থাৎ পাল-সেনরা একক বাংলার রাজা ছিল কিনা জানি না। কারণ 'একক' বাংলা বলে কিছু ছিল কি? লক্ষণ সেনকে কেন 'বাংলা' দখল করতে হলো যদি এক বাংলা হতো? অনেকগুলো ছোট ছোট অঞ্চল, রাজা মিলেই আজকের আমরা– যে নামেই ডাকি নিজেদের। কিন্তু আমরা আজকের ভাবনা দিয়ে বানাই গতকালের বাস্তবতা।

৬.

আমরা প্রাচীন কাল সম্পর্কে যেসব সূত্র পাই বা ব্যবহার করি "বাংলার" ইতিহাস বর্ণনায়, তার একটি বড় অংশ জুড়ে রয়েছে বৌদ্ধ ধর্মের বিকাশ ও বিস্তার। পালদের একটি শ্রেষ্ঠ "বৌদ্ধ" রাজ্য বলা হয়। পণ্ডিতরা তাকে "পরম সৌগত" বলেন বা বলতেন। কিন্তু বৌদ্ধ ধর্ম তো যুদ্ধবিরোধী শান্তির ধর্ম। পালরা তো উত্তর ভারতের দখলদারি যুদ্ধের অংশীদার ছিল। রাষ্ট্রকূট, গুর্জরী প্রতিহারা ও পাল– এই ত্রিমুখী ছন্দের চিত্র থেকে কি প্রমাণ হয় তারা শান্তিপ্রিয় বৌদ্ধ রাজা না, যারা লড়াই দখল বেশ পছন্দ করত? এটি উত্তর ভারতের রাজনীতির অংশ হিসেবে ছিল। কিন্তু আমরা একটি শান্তিপ্রিয় উত্তর-মাৎস্যন্যায় কালের কথা নির্মাণ করেছি আমাদের অতীত নিয়ে।

৭.

পালদের তাড়িয়ে সেন বংশ আসে। উভয়ই ছিল সামন্ত চক্রের সদস্য। সেনদের বলা হয় বৌদ্ধবিরোধী ও হিন্দু বর্ণপ্রথার প্রতিষ্ঠাতা। কিন্তু এই দেশে স্থানীয় মানুষ তো প্রায় সবাই "হাইব্রা জাইব্রা-জোলা", কিসিমের। তারা এককালের আর্যদের ভাষায় "অসুর", "আর্য-আবর্তের" বাইরের মানুষ। তাদের উচ্চবর্ণের পেশা পালন কি সম্ভব? নীরদ চৌধুরীর "হিন্দুইজম" বইতে এটা নিয়ে আলাপ আছে। সেনরা এসেছিল কোথা থেকে? দক্ষিণের কর্ণাটক থেকে উত্তর ভারতের যে ক্ষমতার বলয়, তার সাথে যুক্ত হয়ে। তারা বৌদ্ধবিরোধী ছিল? কোনো প্রমাণ নেই যে তাদের সাধারণ মানুষের ধর্ম চর্চা নিয়ে কোনো ভালো-মন্দ আগ্রহ ছিল। তবে এই সমৃদ্ধ বৌদ্ধ মঠগুলো ছিল পাল সমর্থক, তাই তাদের খেদায়। তাই ভিক্ষুদের পাশের দেশে পালানো স্বাভাবিক না? এটা তো দীর্ঘদিনের পন্থা ক্ষমতা বদল হওয়ার, তাই না? সাথে নিয়ে গেল যেটা তাদের সবচেয়ে কাজে লাগে, যেন নেপালে গিয়ে তাদের ইজ্জত থাকে; ধর্ম গ্রন্থসমূহ। সেসবের মধ্যে একটি হচ্ছে "চর্যাপদ"।

৮.

তাহলে বাংলা ভাষার সাংস্কৃতিক সূত্র হচ্ছে তন্ত্র যেহেতু চর্যাপদ হচ্ছে তান্ত্রিক বৌদ্ধ ধর্মের মন্ত্র-গানের সংকলন। তাহলে কি পাল যুগের মঠগুলো তান্ত্রিক ছিল? কিন্তু এই ধর্ম ভাবনার সূত্র কী? তান্ত্রিক হিন্দু ধর্ম। আর সেই ভাবনার অন্যতম সূত্র কী? বৈদিক হিন্দুপূর্ব মানুষের আদি ধারণাসমূহ? তাহলে শুরু কই? আসলে সব ভাবনায় ধারাবাহিকতা আছে, কোনোটাই হঠাৎ করে হয় না। পরম্পরায় ইতিহাস হয়। তবে কেবল ভিক্ষু আর ব্রাহ্মণ লিখতে পড়তে জানত, সাধারণ মানুষ নয়। তারা পালন করত, যার যেটা সুবিধা। সে পাল এলো না গেল, সেন এলো না গেল, তাতে তার এমন কোনো মাথাব্যথা ছিল, এর কোনো প্রমাণ এখনও মেলেনি কোনো সূত্রে।

তাহলে এতসব আদি ইতিহাস, বিশ্বাস, তত্ত্ব, রাজ্য দখলের মধ্যে পাবলিক আছে? পাবলিকের ভূমিকার ধারাবাহিকতা কী? তখনকার হোক বা এখনকার? ❖

কথাসাহিত্যিক
গবেষক

ছবি :: সাজ্জাদ নয়ন

শেয়ার বাজারে বিনিয়োগে
আপনার বিশ্বস্ত সঙ্গী পুঁজি

পুঁজি
FIRST CAPITAL

GET IT ON Google Play

নিজের ট্রেড নিজেই করি
বেচা-কেনায় সুযোগ ধরি
Exclusive Order Management System Puji

FIRST CAPITAL Securities Limited
Serving Since 1995
Stock Broker & Stock Dealer of DSE & CSE
www.fcsibd.com
+8801332553285 , +880133764610730 +88 0222 3352096

BENGAL COMMERCIAL BANK
inspiring growth

বেঙ্গল ইউনিভার্সাল অ্যাকাউন্ট
অ্যাকাউন্ট এক, সুবিধা অনেক

- জমাকৃত অর্থের ওপর দৈনিক মুনাফা হিসাব
- প্রতি মাসে মুনাফা উত্তোলনের সুবিধা
- এফডিআর-এর মত আকর্ষণীয় মুনাফা
- কারেন্ট অ্যাকাউন্টের মত লেনদেন সুবিধা

www.bgcb.com.bd

দিন-রাত ২৪ ঘন্টা Sonali e-Wallet আপনার সেবায়

ডিজিটাল বাংলাদেশে স্মার্ট ব্যাংকিং
সোনালী ব্যাংক এ
টাকা উত্তোলন এখন ঝামেলাবিহীন

২৪/৭ হটলাইন
১৬৬৩৯
+৮৮০৯৬১০০১৬৬৩৯

অ্যাপ ডাউনলোড করুন এখনই
ANDROID APP ON Google play
Download on the App Store

চেকের বিকল্প হিসেবে
QR কোড দিয়ে
ব্যাংকের যে কোন শাখায়
নগদ টাকা উত্তোলন করুন।

সোনালী ব্যাংক পিএলসি
বিশ্বস্ত ও স্মার্ট
www.sonalibank.com.bd

MATADOR smoothy

- German high flow ink provides unique writing experience.
- Pastel coloured pen barrel provides unique styling.

AWARDED Superbrands BANGLADESH'S CHOICE

www.matador.com.bd
/MatadorStationery
/MatadorStationery
/MatadorStationery
Join us through:

Corporate Office: Matador Harbour (9th Floor), 102, Azimpur Road Dhaka-1205.

ছাড়িয়ে যাই
কোটি মানুষের
জীবন ছুঁয়ে যাই
Meghna Group of Industries
Fresh
No.1 NUMBER 1
SUPER PurE
Actifit
GEAR

IFIC

আইএফআইসি
আমার একাউন্ট
সুবিধা যেমনই চাই
একাউন্ট একটাই

দৈনিক হারে আকর্ষণীয় মুনাফা মাস শেষে জমা হয়

কারেন্ট একাউন্টের মতো যত খুশি লেনদেন

লেনদেনে অনলাইন চার্জ নেই

ব্যবসায়িক লেনদেন করা যায়

ডুয়েল কারেন্সি কার্ড সুবিধা

আইএফআইসি
এমআইএস
মান্থলি ইনকাম স্কিম

আয় করি
আরামসে
eXta
আসে মাসে মাসে

আইএফআইসি ব্যাংকে মান্থলি ইনকাম স্কিম (এমআইএস)-এ
সঞ্চয়ের উপর সেরা মুনাফা

- আকর্ষণীয় মাসিক মুনাফায় পছন্দমতো ১/২/৩ বছর মেয়াদি ফিক্সড ডিপোজিট স্কিম
- মেয়াদ শেষে অটো-রিনিউয়াল সুবিধা
- সর্বনিম্ন বিনিয়োগ ৫০,০০০ টাকা
- বিনিয়োগের বিপরীতে ঋণ সুবিধা
- ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের নামেও এই স্কিম খোলা যায়

থাকুন, দেশের বৃহত্তম ব্যাংকের সাথে

ওয়ান স্টপ সার্ভিস নিয়ে সারা দেশে ছড়িয়ে আছে ১৪০০+ শাখা-উপশাখা

এজেন্ট নয় সরাসরি ব্যাংকের সাথে ব্যাংকিং

বিস্তারিত জানতে
১৬২৫৫
০৯৬৬৬৭ ১৬২৫৫

ব্যাংক এশিয়া
ইসলামিক ব্যাংকিং
শুদ্ধতাই আপনার মুনাফা

ব্যাংক এশিয়া

ব্যাংকিং হোক
শুদ্ধতায়
ও আস্থায়

আধুনিক ব্যাংকিং-এ শরীয়াহ্ সম্মত পরিপূর্ণ আর্থিক সমাধান নিয়ে এলো
ব্যাংক এশিয়া ইসলামিক ব্যাংকিং

২৪/৭ সার্ভিস ১৬২০৫ www.bankasia-bd.com